কষ্টময় শৈশব ও মেধাবী ছাত্রজীবন

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের শৈশব এক অতি সাধারণ উত্তর ভারতীয় নিম্ন মধ্যবিত্ত সনাতন হিন্দু পরিবেশে কেটেছে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রপিতামহ বিখ্যাত জ্যোতিষি পণ্ডিত হরিরাম উপাধ্যায় মথুরা জেলার ব্রজভূমির নাগলা চন্দ্রভাগ গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁর ছোট ভাই ছিলেন শ্রী ঝন্ডুরাম। পণ্ডিত হরিরাম উপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র—ভূদেব, রামপ্রসাদ এবং রামপেয়ারে। ঝন্ডুরাম মহাশয়েরও দুই পুত্র —শঙ্করলাল ও বংশীলাল।

শ্রী রামপ্রসাদের পুত্র ছিলেন ভগবতী প্রসাদ। ভগবতী প্রসাদের বিবাহ শ্রীমতি রামপ্যায়ারীর সঙ্গে হয়েছিল। তিনি খুব ধর্মপরায়না মহিলা ছিলেন। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, বিক্রম সংবত ১৯৭৩, ইংরাজী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর শ্রী ভগবতী প্রসাদের ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। সেই সময় শ্রীমতী রামপ্যায়ারী পিতা শ্রী চুন্নীলাল শুক্লার নিকট ধনকিয়াতে ছিলেন। ওনার পিতা ধনকিয়াতে (রাজস্থানে) স্টেশন মাস্টার ছিলেন। বালকের নাম রাখা হল দীনদয়াল। ডাক নাম 'দীনা'। দুই বৎসর পরে শ্রীমতী রামপেয়ারীর কোলে দ্বিতীয় সন্তান আসে। তার নাম রাখা হয় শিবদয়াল ডাক নাম শিবু।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ও পরম্পরা

পণ্ডিত হরিরাম মহাশয়ের একান্নবর্ত্তী পরিবার। পরিবারও অনেক বড়। পরিবারের মহিলাদের মধ্যে কলহ লেগেই থাকত। দীনদয়ালের বয়স যখন আড়াই বৎসর, তাঁর পিতা ভগবতী প্রসাদ সেইসময় জলেশ্বরে সহায়ক স্টেশন মাস্টার ছিলেন। তিনি পারিবারিক কলহকে শান্ত করার জন্য নিজের কাকীমা ও বিমাতাকে (সৎমা) নিজের কাছে জলেশ্বরে নিয়ে চলে আসেন এবং দীনা, শিবু ও রামপ্যায়ারীকে রাজস্থানের ধনকিয়া গ্রামে পাঠিয়ে দেন। চুন্নীলালের গ্রাম অর্থাৎ রামপ্যায়ারীর বাপের বাড়ী এবং দীনদয়ালের মামাবাড়ী ছিল ফতেহপুর সীকরীর কাছে আগ্রা জেলার

গুড়কী মঢ়াই গ্রামে। আড়াই বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ থেকে চলে আসার পরে দীনদয়াল আর কোনদিন সেখানে ফিরে যাননি। তাঁর পালন পোষণ ও বিকাশ এক অদ্ভূত পরিস্থিতিতে হয়েছিল। এমন পরিস্থিতি যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা পায়, কিন্তু দীনদয়াল সেই পরিবেশে শক্তি সঞ্চয় করে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করেন। দীনদয়ালের জীবন শৈশব অবস্থা থেকে সংস্কার পরিপূর্ণ ছিল।

মৃত্যু দর্শন

মৃত্যুর দর্শন জীবিত মানুষের মনে বৈরাগ্য এনে দেয়। দীনদয়াল উপাধ্যায় শৈশব কালেই নিজের প্রিয়জনেদের মৃত্যু দেখে বিয়োগ জনিত ব্যাথা উপলব্ধি করেছেন। মাত্র আড়াই বছর বয়সে যখন দীনদয়াল নিজের মামাবাড়ীতে দাদুর কাছে আসেন তার কিছুদিন পরেই খবর আসে যে তাঁর পিতা ভগবতী প্রসাদের মৃত্যু হয়েছে। দীনদয়াল পিতৃহীন হলেন, মা রামপ্যায়ারী বিধবা হলেন। দীনদয়ালের শৈশব তাঁর মায়ের অশ্রুভরা চোখ, দাদুর বিষণ্ণ চেহারা দেখেছে। বালক অবোধমন সংবেদনশীলতাকে গ্রহণ করেছিল। পিতৃহারা শিশু দীনদয়ালের শৈশব বিধবা মায়ের কোলে কাটাতে থাকে। এদিকে শোক-তাপ চিন্তায় কাতর রামপ্যায়ারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। অপুষ্টিতে ভুগে অবশেষে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন। সেই সময় ক্ষয়রোগের অর্থ ছিল নিশ্চিত মৃত্যু। দীনদয়ালের বয়স তখন সাত এবং শিবদয়ালের পাঁচ বৎসর। মা তাদেরকে দাদুর কাছে রেখে মৃত্যুর পথে পাড়ি দেন, রামপ্যায়ারী শ্রীরামের চরণে আশ্রয় লাভ করেন। বাল্যকালেই দীনদয়াল পিতামাতার স্নেহ-ছায়া থেকে বঞ্চিত হন।

হয়ত নিয়তি এই বালককে মৃতুর সার্বিক দর্শন করাতে বদ্ধপরিকর ছিল। মায়ের মৃত্যুর দুই বৎসর পরেই মাতামহ শ্রী চুন্নীলাল স্বর্গবাসী হন। তখন ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস। দীনদয়াল নিজে দশ বৎসর বয়সে পিতা-মাতা, এবং মাতামহের স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে মামার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মামী খুবই স্নেহশীলা মাতৃসমা ছিলেন। দীনদয়াল

অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন এবং দশ বৎসর বয়স থেকেই নিজের ছোট ভাই শিবদয়ালের প্রতি যথেষ্ট চিন্তিত এবং স্নেহশীল ছিলেন।

দীনদয়াল রাজস্থানের কোটানগরে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ১৯৩১ সালে তিনি কোটা থেকে রাজগড় জেলায় (অলওয়ার) চলে আসেন। সেইসময় তার মামীমার মৃত্যু হয়। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে এতজন আপনজনের মৃত্যু দীনদয়ালকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই ছোট বয়সে তাঁর উপর ছোট ভাই শিবদয়ালের দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ে। আপনজনের বিয়োগে দুই ভাই এর মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত দীনদয়াল নিজের পালনকর্তাদের মৃত্যু শোকে দুঃখিত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তার পরিপূর্ণরূপ দেখাতে বদ্ধপরিকর ছিল। দীনদয়ালের বয়স তখন ১৮ এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় তার ছোট ভাই শিবদয়াল গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়। তিনি তাঁর ভাইকে রোগমুক্ত করার সবরকম চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল করে, ১৯৩৪ সালের ১৮ই নভেম্বর শিবদয়াল তাঁর বড় ভাই দীনদয়ালকে একলা ফেলে চিরবিদায় নেয়।

এতকিছু ঘটনার পরেও দীনদয়ালের মাথার উপর এক স্নেহশীলার আশীর্বাদ ছিল। বৃদ্ধা দিদিমা দীনদয়ালকে ভীষণ ভালবাসতেন যদিও নিজের লেখাপড়া ও অন্যান্য পারিবারিক কারণে তিনি দিদিমার কাছে বেশী থাকতে পারতেন না তবুও দুজনের মধ্যে একটা আত্মিক টান ছিল। দীনদয়ালের বয়স যখন ১৯, দশম শ্রেণী পাশ করেছেন সেই সময় ১৯৩৫ সালে এক শীতের দিনে তাঁর দিদিমা অসুস্থ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাবা, মা, দাদু, মামীমা, ছোটভাই অবশেষে দিদিমার মৃত্যু তাঁকে জীবনে অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। মৃত্যুর এই প্রহার তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি বরং তাঁকে এক সতেজ উদাসী যুবক তৈরী হতে সাহায্য করে। দীনদয়ালের এক মামাতো বোন ছিল। ভাই ও বোনের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি তখন আগ্রাতে ইংরেজীতে

এম.এ. পড়ছিলেন সেই সময় বোন রমাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীনদয়াল নিজের পড়া ছেড়ে রমাদেবীর সেবা শুশ্রষা করে তাকে সুস্থ করার সব রকম চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস—সব চেষ্টা বিফল করে রমাদেবীর মৃত্যু হয়। ১৯৪০ সালে ২৪ বৎসর বয়সে দীনদয়ালের মনে অনেক মৃত্যুর আঘাত তাঁকে বৈরাগ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অক্ষরশ ঃ অনিকেত

দীনদয়াল শৈশবে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতৃগৃহে ছিলেন। তারপরেই তাঁর প্রবাসী জীবন শুরু হয়, আর তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসেননি। পারিবারিক কারণে তিনি তাঁর দাদু চুন্নীলালের সাথে ধনকিয়াতে ছিলেন। চুন্নীলাল তাঁর দুই পুত্র নথীলাল ও হরিনারায়ণ এবং জামাই ভগবতী প্রসাদ (দীনদয়ালের পিতা) এর মৃত্যুতে প্রচণ্ড শোক পেয়েছিলেন। তিনি চাকরী ছেড়ে নিজের বাড়ী গুড়কী মড়াই-এ ফিরে এসেছিলেন। দীনদয়ালও ধনকিয়া ছেড়ে গুড়কী মড়াই চলে এসেছিলেন। নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত দীনদয়ালের পড়ার কোন সুব্যবস্থা হয়নি। তারপর তিনি নিজের মামা রাধারমনের কাছে চলে আসেন। মামা সেই সময় গঙ্গাপুরে সহায়ক স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। সেখানে তিনি চার বৎসর লেখাপড়া করেন। গঙ্গাপুরে এর বেশী পড়ার ব্যবস্থা ছিলনা। সেইজন্য ১৯২৯ সালের ১২ই জুন তিনি কোটার একটি স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি 'সেল্ফ সাপোর্টিং হাউস' এ তিন বৎসর কাটান। তারপর তাঁকে রাজগড়ে (অলওয়ার জেলা) চলে আসতে হয়। মামা রাধারমনের খুড়তুত ভাই নারায়ণ শুক্ল সেখানে স্টেশন মাস্টার ছিলেন। দীনদয়াল তার কাছে দু বৎসর ছিলেন। ১৯৩৪ সালে নারায়ণ শুক্ল বদলী হয়ে সীকর চলে যান। এক বৎসর সীকর এ থেকে দীনদয়াল দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ করেন। সেখান থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য পিলানী যান এবং সেখান থেকে ১৯৩৬ সালে ইন্টার মিডিয়েট পাশ করেন। সেই বৎসর বি.এ পড়ার জন্য কানপুর যান, সেখান থেকে বি.এ. পাশ করে এম.এ.

পড়ার জন্য আগ্রা যান। সেখানে রাজমণ্ডীতে বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকেন। ১৯৪১ সালে ২৫ বছর বয়সে বি.টি করার জন্য প্রয়াগ চলে যান। এর পরেই তাঁর জীবন সার্বজনীন হয়ে পড়ে। তিনি অখণ্ড প্রবাসী হয়ে যান।

২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত দীনদয়াল উপাধ্যায় রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের ১১টি স্থানে কিছু কিছু সময় ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছেন। নিজ বাসস্থান, দায়িত্ব এবং সুবিধা হয়ত মানুষের মনে মোহ জাগায়। দীনদয়ালের শৈশব এই মোহজাল থেকে শতহস্ত দূরে ছিল।

সামাজিক জীবনে চিরদিনই তিনি ভ্রমণশীল ছিলেন, নিজের ঘর বলতে কিছুই ছিল না। প্রতিদিন নতুন স্থানে, নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় ও তাদের সাথে আন্তরিক পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন এই কার্যশৈলি তিনি বালকাবস্থাতেই শিখে ছিলেন।

মেধাবী ছাত্র-জীবন

প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত দীনদয়াল লেখাপড়া শুরু করতে পারেননি। ১৯২৫ সালে গঙ্গাপুরে তাঁর মামা রাধারমনের কাছে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। বাড়ীতে অন্য কোন বিদ্যার্থী না থাকার কারণে সেখানে পড়ার কোন পরিবেশ ছিল না। সাংসারিক অবস্থা খুব টানাটানির মধ্যে ছিল, কোনরকম সুবিধা তিনি পড়ার জন্য পেতেন না। দীনদয়াল যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখন তাঁর মামা রাধারমন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি মামার সেবা করার জন্য তাঁর সাথে আগ্রা চলে যান। পরীক্ষার কিছুদিন আগে রাধারমন গঙ্গাপুর ফিরে আসেন। সেই সময় দীনদয়াল পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান পান। মামার সেবা করতে করতে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হন। সেই সময় থেকেই বাড়ীর সকলে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিশ্চিত হন তিনি কতটা মেধাবী ছাত্র।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি কোটাতে লেখাপড়া করেন এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য তিনি রাজগড়ে যান। গণিতের ক্ষেত্রে তার

অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র সেইসময় দশম শ্রেণীর গণিতের প্রশ্ন সুন্দরভাবে সমাধান করতেন। পরের বছর তাঁর মামার চাকুরীর বদলির কারণে তাকে সীকর যেতে হয়। তিনি দশম শ্রেণীর পরীক্ষা সীকর কল্যাণ হাইস্কুল থেকে দেন। তিনি শুধুমাত্র স্কুলেই প্রথম হননি, বোর্ডের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান লাভ করেন। তৎকালীন সীকর এর মহারাজা কল্যাণ সিং সেইসময় তাঁকে স্বর্ণপদক, ১০ টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি এবং বইখাতা কেনার জন্য আড়াইশো টাকা বৃত্তি স্বরূপ দান করেন।

সেইসময় উচ্চশিক্ষার জন্য পিলানী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। দীনদয়াল ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য ১৯৩৫ সালে পিলানী চলে যান। ১৯৩৭ সালে ইন্টার মেডিয়েট পরীক্ষায় তিনি সমস্ত বোর্ডের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং সব বিষয়ে অত্যন্ত ভাল নম্বর পান। কলেজে তিনিই প্রথম এই সম্মান জনক নম্বর পেয়েছিলেন। সীকর মহারাজার মত ঘনশ্যাম দাস বিড়লাও একটি স্বর্ণপদক, ১০ টাকার মাসিক ছাত্রবৃত্তি এবং বইখাতা কেনার জন্য ২৫০ টাকা বৃত্তি দিয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে কানপুরে সনাতম ধর্ম কলেজ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ. করার জন্য তিনি আগ্রাতে সেন্ট জোন্স কলেজে ভর্তি হন। এম.এ. প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর নম্বর পান কিন্তু বোনের অসুস্থতার কারণে এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে পারেননি। মামার ইচ্ছানুযায়ী দীনদয়াল প্রশাসনিক পরীক্ষায় (সিভিল সার্ভিসে) বসেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ইন্টারভিউতেও উত্তীর্ণ হয়ে নির্বাচিত হন। কিন্তু প্রশাসনিক কাজকর্মে ইচ্ছা না থাকয়ে তিনি প্রয়াগে চলে যান বি.টি পড়ার জন্য।

তাঁর এই গভীর অধ্যয়ন সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার পর আরও বৃদ্ধি পায়। বিবিধ সামাজিক ও দার্শনিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা যে তাঁর মধ্যে আছে তা তার ছাত্র জীবনেই দেখা গিয়েছিল।

ছাত্র জীবনে আগ্রাতে নানাজী দেশমুখ এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়

একসাথে থাকতেন। দীনদয়ালের সহজ, সরল, সততার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য নানাজী একটি ঘটনার কথা এইভাবে শুনিয়েছিলেন।

"একদিন সকালে আমরা দুজন বাজারে গিয়ে দু পয়সার সব্জি কিনে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দীনদয়াল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, নানাজী খুব সমস্যা হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল 'আমার পকেটে চার পয়সা ছিল। তার মধ্যে একটা অচল পয়সা। ঐ অচল পয়সাটাই আমি সব্জিওয়ালীকে দিয়েছি। আমার পকেটের অবশিষ্ট দুটো পয়সাই ভাল। সে কি ভাবছে কে জানে? আমি তাকে ভাল পয়সাটা দিয়ে আসি।

ওনার চেহারায় কেমন একটা অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল। আমরা আবার ফিরে সেই সব্জিওয়ালীর কাছে পৌঁছে তাকে সব ঘটনা বললাম, কিন্তু সে বলতে লাগল কে খুঁজবে তোমার অচল পয়সা? যা দিয়েছো সেটা থাক, তোমরা ফিরে যাও। কিন্তু দীনদয়াল ফিরতে নারাজ। অবশেষে দীনদয়াল নিজেই অনেক পয়সার মধ্যে থেকে তার অচল পয়সা খুঁজে বার করে নিজের পকেট থেকে ভাল পয়সা দিয়ে তবে শান্তি পেলেন। এই কাণ্ড দেখে বুড়ী সব্জীওয়ালীর চোখ জলে ভরে এসেছিল। সে বলতে লাগল, "বাবা, তুমি কত ভাল মানুষ, ভগবান তোমার ভাল করবেন"।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দীনদয়ালজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের ভোটে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস জয় লাভ করার পরে মুসলীম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে বোঝাপড়া নষ্ট হয়ে যায়। মুসলীম লীগের নেতা চৌধুরী খালিক অজুমা কংগ্রেসের সাথে একত্রে কাজ করতে অস্বীকার করে, সেই সময় দ্বি-রাষ্ট্রবাদের সূচনা হয়। সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রের জন্য মূলসমানদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মানসিকতা তৈরী করা হচ্ছিল। ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলীম লীগ পাকিস্তান তৈরীর প্রস্তাব সমর্থন করে। এই পৃথক রাষ্ট্রের মনোভাব ভারতের প্রত্যেক রাষ্ট্রবাদী মানুষের মনে আঘাত হানে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের যুবক মন এই

মানসিকতায় বিচলিত ও আহত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা এই দ্বি-রাষ্ট্রবাদী সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছিল। দীনদয়াল উপাধ্যায় এই দ্বিরাষ্ট্রবাদী সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রচণ্ড ভাবে বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হলেন। সংঘের কাজকর্ম তার মানসিকতার অনুকূলে ছিল। কানপুরে সহপাঠী বালুজী মহাশব্দে তাকে সঙ্ঘে নিয়ে আসেন। সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশবরাও বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। বাবা সাহেব আপটে এবং দাদা রাও পরমার্থ, ওনার ছাত্রাবাসেই এসে থাকতেন। স্বতন্ত্রবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার কানপুরে এলে দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁকে সঙ্ঘ শাখায় আমন্ত্রিত করে বৌদ্ধিক বর্গ করিয়েছিলেন। কানপুরে শ্রী সুন্দর সিং ভাণ্ডারী দীনদয়ালের সহপাঠী ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অনুশাসিত যুবকদের একটি সংগঠন যেখানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর্তা তৈরী করা হয়। এই প্রশিক্ষণ তিন বৎসরের। সেইসময় গ্রীষ্মকালে নাগপুরে চল্লিশ দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবির চলত এবং সেটাকে 'সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ' বলা হত। দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে প্রথম বর্ষের শিক্ষাবর্গ এবং ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষাবর্গ শেষ করেন। প্রশিক্ষণের পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংস্কারিত সমাজ দ্বারা স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করা ও তার পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব।

দীনদয়াল উপাধ্যায় সঙ্ঘে শারীরিক কার্যক্রম খুব ভালভাবে করতে পারতেন না, কিন্তু বৌদ্ধিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন।

এ সম্পর্কে শ্রী বাবা সাহেব আপ্তে লিখছেন---"উত্তর পত্রে দীনদয়ালজী অনেকটা অংশ পদ্যরূপে লিখতেন, কিন্তু তা শুধুমাত্র ছড়া বা কল্পনা ছিল না। গদ্যের স্থানে পদ্য আকারে লিখতেন, যা অত্যন্ত সঠিক ও শুদ্ধ থাকত। যেটা পড়ে যে কেউ প্রভাবিত হত।"

নিজের পড়া শেষ করে এবং সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ শেষে দীনদয়াল উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক হয়ে যান।

আজীবনকাল সংঘের প্রচারকই রয়ে যান। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পরিবার পরিজন-বিশেষতঃ মামা তাঁর এই সিদ্ধান্তে খুবই বিরক্ত ছিলেন। প্রশাসনিক কাজকর্ম পছন্দ নয় সেইজন্য তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেও চাকুরী করেননি, কিন্তু সকলে ভেবেছিল তিনি হয়ত অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হবেন কারণ তিনি অধ্যাপনা খুবই পছন্দ করতেন। সেইজন্য কানপুর থেকে বি.টি. পাশ করেন। কিন্তু দীনদয়াল উপাধ্যায় ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসীদের মত আজীবন প্রচারক হিসাবে সঙ্ঘে যোগ দিলে তাঁর মামা খুবই দিলে দুঃখ পান। উত্তরপ্রদেশের লখীমপুর জেলায় জেলা প্রচারক হিসাবে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ দ্বারা পাকিস্তান তৈরীর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, হিংসা বেড়ে গিয়েছিল। দীনদয়ালের মন এই পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য অস্থির হয়ে উঠল। তিনি পরিবার পরিজন ভুলে সম্পূর্ণ রূপে সঙ্ঘের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেন।

তিনি তাঁর মামাকে একটি চিঠিতে লিখলেন "আমাদের পতনের কারণ আমাদের মধ্যে সংগঠনের অভাব। তাছাড়া অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি আমাদের পিছিয়ে থাকার কারণ। আর ব্যক্তিগত নাম ও যশের কথা বলেছেন? সে তো আপনিও জানেন গোলামদের আবার কিবা নাম আর কিবা যশ"।

নিজের কাজের প্রেরণা যুবকাবস্থায় ইতিহাসের যে ধারা থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নীচের পত্র থেকে তা জানা যায়—

"যে সমাজ ও ধর্মের রক্ষার জন্য 'রাম' বনবাস গমন করেছিলেন, কৃষ্ণ অনেক কষ্ট করেছেন, রানা প্রতাপ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছেন, শিবাজী তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছেন, গুরু গোবিন্দ সিংহের ছোট ছোট দুটি সন্তানকে জীবন্ত দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য আমরা আমাদের জীবনের আকাঙ্খা, মিথ্যা বাসনাকে ত্যাগ করতে পারব না?"

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি লখীমপুরে প্রচারক ছিলেন। প্রথমে তিনি জেলার এবং পরে বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কার্য্যসিদ্ধতা, সংস্কারক্ষমতা এবং বৌদ্ধিক প্রখরতা দেখে ১৯৪৫ সালে তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তরপ্রদেশের সহ-প্রান্ত প্রচারক-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সময় উত্তর প্রদেশের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন শ্রী ভাউরাও দেওরস। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সংগঠনাত্মক প্রতিভা এবং সঙ্ঘ কার্য্যে তাঁর যোগদানের বিষয়ে শ্রী ভাউরাও দেওরস লেখেন "সঙ্ঘের সেই প্রথম দিনে, যখন কাজ অনেক কন্টকাকীর্ণ ছিল, সেই সময় তুমি (শ্রী উপাধ্যায়) কাজের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলে। সেইসময় সঙ্ঘের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সমগ্র উত্তর প্রদেশের জনতা কিছুই জানত না। তুমি স্বয়ংসেবক হিসাবে এই কার্য্যভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলে। আজ সঙ্ঘের বিশাল এইরূপ এবং কার্য্যকর্তারা তোমারই পরিশ্রম এবং কর্ত্তব্যের ফল। অনেক সঙ্ঘ কার্যকর্তা তোমার জীবনের আদর্শকে গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। একজন আদর্শ স্বয়ংসেবকের যে সকল গুণের কথা শুনেছিলাম, তুমি ছিলে তার মূর্তিমান প্রতীক। তুমি প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অসামান্য কৃতিত্ব, নিরহংকার ও নম্রতার এক উজ্জ্বল আদর্শ।

শুরুর সেই দিনগুলিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ উত্তরপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধিক পল্লবিত হয়েছিল যার অন্যতম কারণ ছিল দীনদয়াল উপাধ্যায়।

গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে যখন সঙ্ঘ নিষিদ্ধ হল সেই সময় দীনদয়ালজী প্রচার ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল সূত্রধার ছিলেন। সরকার 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। অজ্ঞাতবাসে থেকেই দীনদয়ালজী 'হিমালয়' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হলে তিনি 'রাষ্ট্রভক্ত' প্রকাশ করেন। এই সময়েই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংবিধান লেখা হয় যাতে দীনদয়ালজীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

লেখক এবং সাংবাদিক

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাষ্ট্রীয়তা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র সম্পর্কে

প্রচলিত ধারণার বাইরে ভিন্ন বিশ্লেষণ ছিল। সঙ্ঘে কিশোর বিদ্যার্থীর সংখ্যা অনেক। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের কথা, এক প্রান্ত বৈঠকে প্রান্তপ্রচারক ভাউরাও খুব চিন্তিত ভাবে বললেন আমাদের চিন্তাধারা বালকের জন্য তাদের ভাষায় কোথাও ব্যক্ত করা নেই। বাস্তবে ছোটদের জন্য শিশু সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দীনদয়ালজী চুপচাপ সব কথা শুনলেন। তারপরে সারা রাত্রি জেগে তিনি লিখলেন। সকালে সেই পাণ্ডুলিপি ভাউরাও এর হাতে দিয়ে বললেন দেখুন তো এই বইটা। বালক স্বয়ংসেবকদের জন্য কেমন হবে?' সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে দীনদয়ালজী এক রাতের মধ্যে একটি ছোটদের উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। তাঁর প্রথম বই 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' নামে প্রকাশিত হয়।

সেইসময় স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যে পথ অবলম্বন করা হচ্ছিল তার সঙ্গে সঙ্ঘ নীতিগত ভাবে একমত হতে পারছিল না। সঙ্ঘ রাজনৈতিক দৃঢ়তার অভাব বোধ করছিল। 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' বই এর ঐতিহাসিক চরিত্র চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্যের মাধ্যমে দীনদয়াল উপাধ্যায় পরাক্রম এবং রণনীতি কুশলতায় কিশোর মনকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর চেষ্টায় সফল হন। এই পুস্তকের ভাষা এতই প্রখর এবং আকর্ষক ছিল যে একবার পড়া শুরু করলে, শেষ পর্যন্ত পড়ার ইচ্ছা হত। ভাষার লালিত্য এবং বিচারের প্রখরতা এই লেখার বৈশিষ্ট ছিল।

শিশু সাহিত্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তরুণদের জন্যও এইরকম কোন সাহিত্য লেখার চাহিদা বাড়ছিল। এই চাহিদা পূরণের জন্য দীনদয়ালজী দ্বিতীয় উপন্যাস 'জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য' রচনা করেন।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাসের চরিত্র এবং ঘটনা পুরানো, কিন্তু এর ভাব, বিচার, পরিবেশ সবই নতুন। দীনদয়াল যে শাখা পদ্ধতিতে সংঙ্ঘের কার্য্য করতেন, তাতে সময় দেওয়ার জন্য যুবকদের প্রেরণা দেওয়া, দেশের সাংস্কৃতিক গৌরব বাড়ানো এবং নিজের জীবনে সমর্পণ করার ইচ্ছা তৈরী করাই এই রচনার উদ্দেশ্য ছিল।

'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য' এই উপন্যাস গুলির প্রকাশন যথাক্রমে ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে হয়। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ সাহিত্য জীবনে, এইদুটি সাহিত্যই সৃষ্টি হয়। তাঁর সাহিত্যিক রূপে প্রথম সৃষ্টি এতটাই প্রখর ছিল যে, তিনি যদি আগামী দিনে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এগোতেন তাহলে হয়ত ভারতবর্ষের একজন প্রথমসারির সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য হতেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে তিনি আর কোন উপন্যাস রচনায় হাত দেন নি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক থাকাকালীন দীনদয়াল উপাধ্যায় অনেকগুলো পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর চেষ্টা ও প্রেরণায় ১৯৪৫ সালে মাসিক রাষ্ট্রধর্ম ও সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে দৈনিক পত্রিকা স্বদেশ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলির প্রত্যক্ষ সম্পাদক হিসাবে দীনদয়ালজী কখনোই যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বাস্তবিক সঞ্চালক, সম্পাদক ও আবশ্যকতা অনুসারে কম্পোজিটর মেসিন ম্যান এসব কাজও তিনি করতেন।

কেন অখণ্ড ভারত?

দীনদয়াল উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রবাদের জাগরণ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কুটিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা অন্যরকম চিন্তাভাবনা করে রেখেছিল। ইংরাজরা স্বাধীনতার আন্দোলনকে লালসার অভিযানে বদলে দিয়েছিল। ভারত ছেড়ে যাওয়ার শর্ত হিসাবে ইংরাজরা সম্প্রদায়িক আধারের উপর ভিত্তি করে ভারতকে বিভাজিত করতে দ্বি-রাষ্ট্রবাদের উপর জোর দেয়। সেইসময় ভারতের নেতৃত্বে থাকা কোন ব্যক্তি কোন প্রতিবাদ করেননি এবং ইংরাজরা ভারতকে বিভক্ত করে অবশেষে দেশ ছাড়ে। এই বিভাজনের ফলস্বরূপ প্রচুর রক্তপাত হয়। দেশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ভারত ভাগ দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মনে আঘাত হেনেছিল।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মত অনুসারে অখণ্ড ভারত কেবলমাত্র দেশের ভৌগোলিক একতার পরিচায়ক নয়, সমগ্র ভারতীয় জীবনের দৃষ্টিকোণ

থেকে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের দর্শন করায়। অতএব আমাদের জন্য অখণ্ড ভারত কোন রাজনৈতিক শ্লোগান নয় বরং এটি আমাদের সমগ্র জীবনদর্শনের মূলাধার।

অখণ্ড ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমির বিশ্লেষণার্থে উপাধ্যায়জী 'অখণ্ড ভারত কেন' নামক একটি বই লেখেন। সেই বইয়ে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করে যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসা ভারতীয় সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরম্পরার উল্লেখ করেছেন যা ভারতকে ভৌগলিক দিক থেকে একাত্ম-রাষ্ট্র রূপে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে। বইটি অনেক তথ্য সমৃদ্ধ এবং এর ভাষা খুবই ভাবপ্রবণ।

উপাধ্যায়জী নিজের বইয়ে ভারতের দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার কারণ হিসাবে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতি, কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয়তার বিকৃত ধারণা ও তুষ্টিকরণের নীতিকে দায়ী করেছেন। ১৮৮৭ সালের ২০ ডিসেম্বর স্যার সৈয়দ আহমেদ যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি মুসলমানদের কংগ্রেস এবং হিন্দুদের থেকে পৃথক থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উপাধ্যায়জী এই বই-এ সেটা সুবিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। এই ভাষণ ছিল মুস্‌লিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম ধাপ, যা আলীগড় মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলিম লীগ পাকিস্তানের পৃথক হওয়ার চাহিদাকে বাস্তবিক রূপে বিকশিত করেছে।

কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলিম নীতির এবং মিশ্রিত সংস্কৃতির সিদ্ধান্তকে পরোক্ষভাবে দ্বি-রাষ্ট্রবাদী নীতি হিসাবে উপাধ্যায়জী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন মুসলিমদের আলাদা সংস্কৃতি এবং ঐ সংস্কৃতির পোষণের বিচারই তুষ্ঠিকরনের জন্ম দেয় এবং রাষ্ট্রীয়তার অবধারণাকে বিকৃত করে। তিনি বলেন খিলাফত আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আখ্যা দিয়ে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয়তাকে কলঙ্কিতই করিনি উপরন্তু মুসলিমদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেছি যে তাদের রাষ্ট্রীয় হওয়ার জন্য ইসলামের নামে প্রচলিত ভারত বাহ্য প্রবৃত্তির ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই বরং তাদের ইচ্ছা হলেই তারা ভারতের রাষ্ট্রীয়তার অঙ্গ হতে পারে ফলস্বরূপ ১৯২৩

সালে কাকীনাড়া কংগ্রেসের অধ্যক্ষ মহম্মদ আলী বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বিরোধীতা করে।

কংগ্রেসের এই প্রবৃত্তিই সমগ্র মুস্‌লিম সমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম নেতৃত্বের পিছনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যদিও ১৯৩৫-৩৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সেইরকম ভাবে সফলতা পায়নি, কিন্তু কংগ্রেস সরকারের মুসলিম তোষণনীতির সুবিধা নিয়ে মুসলমানরা নিজেদের সংগঠনকে আরো মজবুত করে। জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য প্রথমে ১৪ সূত্রীয় এবং ২১ সূত্রীয় কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে। কিন্তু বোঝাপড়া সফল হয়নি, কারণ তারা সমঝোতাই চায়নি। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগের ফলস্বরূপ মুসলীম লীগ মুক্তি দিবস পালন করে এবং ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তানকে নিজেদের স্থান হিসাবে ঘোষণা করে।

ইংরাজদের শর্ত ছিল ভারত বিভাজন না মেনে নিলে ভারত স্বাধীনতা পাবে না এবং রক্তপাত হবে। দীনদয়ালজী এই তথ্য মেনে নিতে পারেনি নি। তাঁর বক্তব্য ছিল কংগ্রেসের নেতারা যদি নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে ভারতের জনজাগৃতিতে সাহায্য করত তাহলে ইংরাজরা অখণ্ড ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হত এবং কংগ্রেসের হাতেই সব ক্ষমতা সঁপে দিয়ে যেতো।

রক্তপাতের বিষয়ে তার মত ভারত বিভাজনের পূর্বে এবং পরে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তত মৃত্যু দুই বিশ্বযুদ্ধে হয়নি। তাছাড়া লুট, অপহরণ এবং হত্যাকাণ্ডে মানুষের জঘন্যতম পশুবৃত্তির প্রকাশ দেখা গেছে, সে সব কোন যুদ্ধেই দেখা যায় না।

ভারত খন্ডিত হওয়ায় আমাদের কোন সমস্যার সমাধান তো হয়নি বরং সমস্যা আরো জটিল হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে বিবাদের কারণে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজ্জ্বল মুখ বার বার নীচু হয়েছে। হিন্দু-মুসলীম সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দীনদয়াল উপাধ্যায় নিজের বই-এর শেষ অংশে বলেছেন বাস্তবে ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্য যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ

দ্বারা ভৌগলিক সীমা বাড়তে পারে কিন্তু রাষ্ট্রীয় একতা বাড়ে না। অখণ্ডতা শুধুমাত্র ভৌগলিক নয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ। দুই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত এবং সমঝোতার (বোঝাপড়ার) ফলস্বরূপ দেশ বিভক্ত হয়। একটি রাষ্ট্র যদি নিজেদের সিদ্ধান্ত এবং কর্মের উপর অবিচল থাকে তাহলেই অখণ্ড ভারত হওয়া সম্ভব। যে মুসলীমরা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে পিছিয়ে রয়েছে তারাও আমাদের সহযোগী হতে পারে, যদি আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয়তার সঙ্গে সমঝোতার প্রবৃত্তি ত্যাগ করি। হয়ত আজকের এই পরিস্থিতিতে যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে সেটাই আগামীকাল সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের নিজেদের আদর্শের উপর অবিচল থাকতে হবে।

অন্য একটি লেখনীতে রাষ্ট্রীয়তার (দেশভক্তির) সঙ্গে আপস না করার মানসিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দীনদয়ালজী বলেছেন "যদি আমরা একতা চাই তাহলে ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তা যেটা হিন্দু রাষ্ট্রীয়তা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতিকে মানদণ্ড মেনে এগিয়ে চলা উচিত। ভাগীরথীর এই পূণ্যধারায় সব প্রবাহের মিলন হওয়া উচিত। যমুনাও মিলিত হবে আর নিজের কালিমা দূর করে গঙ্গার স্বচ্ছ ধারায় এক হয়ে যাবে।

'অখণ্ড ভারত কেন' এই বইটি দীনদয়াল উপাধ্যায় যে সময় লিখেছিলেন, সেইসময় তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন। তাঁর লেখনী কার্য্য সদা সতত চলতে থাকে।

রাজনীতিতে সংস্কৃতির রাজদূত

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন এবার কংগ্রেস দলকে ভঙ্গ করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পৃথক-পৃথক দল তৈরী হওয়া উচিত। খামখেয়ালীপনার জন্য সমাজবাদীরা কংগ্রেস দল ছেড়ে দিয়েছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্বাধীনভারতের মন্ত্রী মণ্ডলীতে প্রথম শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত সমঝোতা হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই সমঝোতার বিরুদ্ধে ছিলেন। সেই সময় তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। ১৯৫১

সালের ২১ শে অক্টোবর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অধ্যক্ষতায় ভারতীয় জনসংঘ'-এর স্থাপনা হয়। এই স্থাপনার পূর্বে ড. মুখার্জী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ততকালীন সরসংঘচালক শ্রী মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের সঙ্গে দেখা করেন। যেখানে রাষ্ট্রের অবধারণার উপরে দু-জনেই একমত হয়েছিলেন। শ্রী গুরুজী গোলওয়ালকর একস্থানে লিখেছেন "যখন এমন মতৈক্য হল তখন আমি আমার নিষ্ঠাবান-তপস্বী সহযোগীদের চয়ন করলাম যারা নিঃস্বার্থ ও দৃঢ় নিশ্চিত ছিল, যারা নূতন তৈরী হওয়া দলের ভার নিজের কাঁধে নিতে পারবে। এদের মাধ্যমেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, জনসংঘরূপী তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন।"

শ্রী গুরুজী আরও লিখেছেন "আমরা দুজন (ডাঃ মুখার্জী ও শ্রীগুরুজী) নিজেদের সংগঠন ও কার্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরস্পর মত বিনিময় ছাড়া কখনও গ্রহণ করিনি- আমরা নজর রাখতাম যাতে কেউ একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করে অথবা একের অন্যের সম্পর্কে ভুল ধারণা না তৈরি হয়।"

শ্রীগুরুজী গোলওয়ালকর যে সমস্ত নিঃস্বার্থ, দৃঢ় চরিত্রের কার্যকর্তাদের শ্যামপ্রসাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশন ২৯,৩০,৩১ ডিসেম্বর ১৯৫২ কানপুর শহরে হয়েছিল। দীনদয়াল এই নবগঠিত দলটির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এখান থেকেই দীনদয়ালজী সর্বভারতীয় স্তরে রাজনীতির আঙ্গিনায় পা রাখেন। তাঁর তাত্ত্বিক ক্ষমতার পরিচয় প্রথম অধিবেশনেই বোঝা যায়। এই অধিবেশনের ১৫টি প্রস্তাবের মধ্যে দীনদয়ালজী একাই ৭টি তৈরী করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে আগে দেখেন নি। কিন্তু কানপুর অধিবেশনে তাঁর কর্মদক্ষতা, সংগঠন ক্ষমতা ও বৈচারিক গভীরতা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ পরবর্তীকালে দীনদয়ালজী সম্পর্কে বলেছিলেন 'আমি যদি দুটি দীনদয়াল পেতাম তবে ভারতীয় রাজনীতির মানচিত্রই বদলে দিতাম'।

দীনদয়ালজীর কোন ব্যক্তিগত জীবন ছিল না, তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক

সঙ্ঘের জীবন সমর্পিত প্রচারক ছিলেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাজ তিনি একজন স্বয়ংসেবকের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জনসংঘের কাজ ছাড়া তাঁর কোন সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবন ছিল না। জীবনের ১৭ বছর উনি জনসংঘের সাধারণ সম্পাদক ও মার্গদর্শক হিসাবে কাজ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ও বিচারের বিষয়ে ডাঃ মুখার্জী ও গোলওয়ালকরজীর মধ্যে যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল সেই পথ ধরেই দীনদয়ালজী কানপুরের প্রথম অধিবেশনে জনসংঘের লক্ষ্য স্পষ্ট করতে 'সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান' প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। ভৌগলিক অথবা আঞ্চলিক রাষ্ট্রবাদকে অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন 'ভারত ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় কেবলমাত্র ভৌগলিক একতা রাষ্ট্রীয়তার জন্য যথেষ্ট নয়। এক দেশের অধিবাসীরা তখনই রাষ্ট্রীয় হতে পারে যখন একটি সংস্কৃতির বন্ধনে তারা বাঁধা পড়বে। যখন ভারতীয় সমাজ একটি মাত্র সংস্কৃতির অনুগামী ছিল তখন অনেক রাজ্য থাকলেও আন্তরিক একতা সব সময় বজায় ছিল। কিন্তু যখনই বিদেশী শাসক নিজের লোকেদের রক্ষার জন্য দেশের একাত্মতা ভেঙ্গে বিদেশী সংস্কৃতির আমদানি করল তখন থেকেই ভারতের রাষ্ট্রীয়তা বিপদের সম্মুখীন হল। বহু শতাব্দী ধরে যে এক রাষ্ট্রের ঘোষণা আমরা করেছিলাম ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কারণে দ্বি-রাষ্ট্রবাদের ধারণাই এখানে বিজয়ী হয়েছে। দেশ বিভক্ত হয়েছে এবং অমুসলিমদের পাকিস্তানে থাকা অসম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে ভারতে মুসলিম সংস্কৃতিকে আলাদা চিহ্নিত করে তাকে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে দ্বি-রাষ্ট্রবাদের ধারণা আরও জোরদার হয়েছে যা আমাদের রাষ্ট্র নির্মাণের পক্ষে এক অন্যতম বাধা। এই কারণে ভারতে রাষ্ট্রীয়তা ও তার বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন ভারতে একই সংস্কৃতি, এই ধারণার প্রচার, প্রসার ও বৃদ্ধি। এই প্রস্তাবেই কোনও সম্প্রদায়ের নাম না করে সকলের ভারতীয়করণ করার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি সমাজের কর্তব্য হল ভারতীয়

জনতার সমস্ত অংশকে ভারতীয়করণ করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করা, বিদেশী ষড়যন্ত্রের কারণে যারা দেশের থেকে মুখ ফিরিয়ে বিদেশীদের অনুসরণ করছে, হিন্দু সমাজের কর্তব্য হল স্নেহের সাথে তাদের সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কেবলমাত্র এই রাস্তাতেই সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ হবে ও রাষ্ট্রের একতা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে।

ভারতের অন্য রাজনৈতিক দলগুলি থেকে ভারতীয় জনসংঘকে আলাদা করার জন্য এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস, সমাজবাদী, সাম্যবাদী সবগুলি রাজনৈতিক দলই ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতি, রাষ্ট্র-রাজ্যের কল্পনা ও ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাষ্ট্রবাদকে প্রাধান্য দেয় যেগুলি তারা বিদেশী শাসকদের ও পশ্চিমী চিন্তাধারার মানুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। তারা ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে ভারতীয় রাষ্ট্রবাদকে বিচার করেছে ও তাতেই বিশ্বাস রেখেছে। মুসলমানদের আলাদা সংস্কৃতি ও উপাসনা পদ্ধতির রক্ষা ও সংখ্যালঘু হিসাবে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আছে অন্যদিকে হিন্দু-মহাসভা মুসলমানদের ভারতীয় হিসাবে স্বীকারই করে না। সেই কারণেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং জনসংঘের দরজা সমস্ত উপাসনা পদ্ধতির মানুষের জন্য খুলে রেখেছেন।

দীনদয়ালজী মুসলিম ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য 'হিন্দু সমাজেরই নিজস্ব অঙ্গ' এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং তাদের ভারতীয় জন জীবনের অংশ হিসাবে স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে এটাও মেনে নিয়েছেন যে মুসলমান সমাজকে আলাদা করার জন্য হিন্দু সমাজের নিজস্ব কিছু ভুলও আছে যেটি এখন স্নেহ ও আত্মীয়তার দ্বারা সংশোধন করা দরকার। মুসলমান ও খৃষ্টানদের আলাদা সংস্কৃতি ও তা সংরক্ষণের চিন্তা এবং সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর ভাবনা রাষ্ট্রের জন্য বিভেদকারী ও একান্ত ভাবে সাম্প্রদায়িক একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। সমস্ত দলের নির্বাচনী ঘোষণা পত্র বিশ্লেষণ করে দীনদয়ালজী বলেছিলেন—কংগ্রেস, সমাজবাদী, স্বতন্ত্র পার্টি ও কমিউনিস্টদের ঘোষণা পত্র বিশ্লেষণ করলে

মনে হয় এদেশে মুসলমানদের সাথে ন্যায় করা হচ্ছে না—ভারতীয় জনসংঘ এই প্রকার সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর বিভাজন স্বীকার করে না এবং তা করা উচিত একথাও মনে করে না। জনসংঘ ভারতকে একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য রাষ্ট্র বলে মনে করে। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের একটিই সংস্কৃতি একথা আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি ও তাতে আস্থা রাখি এবং ধর্মের আধারে ভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করি না। জনসংঘ 'এক রাষ্ট্র ও এক সংস্কৃতি' এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখে। কোন ঐতিহাসিক অথবা অন্যকোন কারণে এই দেশের জন সমাজের একটা অংশ রাষ্ট্র জীবনের পবিত্র ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে আর কিছু অংশ রাষ্ট্র বিরোধী হয়েছে।

জনসংঘ এর নিরাময় চায় কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোবৃত্তিকে কখনও সমর্থন করে না। আমাদের মতে তারাও রাষ্ট্রজীবনের এক জীবন্ত অঙ্গ। রাষ্ট্রীয়তার এই সাংস্কৃতিক ধারণাই জনসংঘের বিশেষত্ব। অতএব কেবল লোক কল্যাণকারী রাষ্ট্র বা সেকুলারবাদী বা ভৌতিকতাবাদের (কমিউনিজম) রাজনীতি আমাদের প্রেরণা হয়নি। সাধারণত পশ্চিমের দেশগুলিই অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের প্রেরণা। দীনদয়ালজী বলতেন 'জনসংঘ মূলতঃ সংস্কৃতিবাদী। সংস্কৃতির আধারেই আমাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তন দাঁড়িয়ে আছে।

দীনদয়ালজী ভারতীয় জনসংঘকে আকার দিয়েছেন, বিস্তার করেছেন এবং একটি বিশিষ্ট ব্যবহারিক পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক নেতা কখনও ছিলেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ জরুরী। ১৯৬৪ সালে রাজস্থানের জয়পুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গ্রীষ্মকালীন শিবিরের বৌদ্ধিক বর্গে তিনি বলেন—স্বয়ংসেবকদের রাজনীতির প্রতি নির্লিপ্ত থাকা উচিত যেমন আমি আছি।' তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—'আপনি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদক, আপনি কিভাবে রাজনীতির প্রতি নির্লিপ্ত হলেন? উত্তরে দীনদয়ালজী বলেন—আমি রাজনীতি করার জন্য রাজনীতিতে আসিনি, আমি রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক রাজদূত। তার কথায় রাজনীতি সাংস্কৃতি শূন্য হয়ে যাওয়া ভালো নয়।

তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ একটি সাংস্কৃতিবাদী দল হিসাবে গড়ে উঠবে।

রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার রাজনীতি

অখন্ড ভারতের যে বৈচারিক পটভূমিকায় ভারতীয় জনসংঘের জন্ম হয়েছিল তার ফলে জন্মের প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পক্ষে ও দ্বি-রাষ্ট্রবাদের ও দ্বি-জাতিতত্বের ধারণায় উৎপন্ন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনসংঘ আওয়াজ তুলেছিল। আভ্যন্তরিন সমস্যা যেমন প্রাদেশিকতা, জাত-পাত ও ভাষা সমস্যার সমাধান ভারতীয় জনসংঘ যে আন্তরিকতা ও কুশলতার সাথে করেছে অন্য কোন রাজনৈতিক দল তা করতে পারে নি। এই সমস্ত রাষ্ট্রবাদী চিন্তার জনক ছিলেন দীনদয়ালজী। তাঁর হাতে বিকশিত জনসংঘ দেশের অখন্ডতার বিষয়টি কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যম করেনি, দেশের অখন্ডতার বিষয়কে সংগঠিত করে সমাজকে বলিদান দেবার জন্য তৈরী করেছে।

কাশ্মীর আন্দোলন

ভারতীয় জনসংঘ কাশ্মীর নিয়ে যে আন্দোলন শুরু করেছিল তার তিনটি জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল—এক দেশে দুটি বিধান, এক দেশে দুই প্রধান, এক দেশে দুই নিশান চলবে না, চলবে না। এই আন্দোলনটি প্রধানতঃ জম্মুর প্রজাপরিষদ দ্বারা চালিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ৬ মার্চ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অনুমতি পত্র ছাড়াই কাশ্মীরে প্রবেশ করেন এবং কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতে মিলিয়ে দেবার দাবীতে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। দেশের অখন্ডতা রক্ষায় নিজেকে বলি দেন। দীনদয়ালজী সত্যাগ্রহের জন্য সমস্ত দেশ থেকে সত্যাগ্রহী সংগ্রহ ও সংগঠনকে এই কাজের জন্য তৈরি করার প্রয়াস করতে থাকেন।

পাঞ্চজন্য পত্রিকায় কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি—স্বাধীনতার পরই কাশ্মীরে পাকিস্তানের আক্রমণ ও সেই আক্রমণ প্রতিরোধে ভারত সরকারের উদাসীনতা, কাশ্মীর বিষয়টিকে রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে যাওয়া, কাশ্মীরের

ভবিষ্যতের জন্য জনমত সংগ্রহ করার কথা বলা, ৩৭০ ধারার মাধ্যমে বিশেষ অধিকার প্রদান, এই সমস্ত বিষয়গুলি সবিস্তারে ও বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

এই সময় স্বতন্ত্র পার্টির ইচ্ছা ছিল যেহেতু জনসংঘ বাম বিরোধী সুতরাং দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে জনসংঘ মিশে যাক। জনসংঘের কিছু কার্যকর্তা এই প্রস্তাবে রাজী ছিলেন, কথাবার্তাও শুরু হয়। নির্বাচনে আসন সমঝোতাও হয়। কিন্তু ঠিক এই সময়েই স্বতন্ত্র পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাসানি বিবৃতি দিয়ে বলেন যে স্বতন্ত্র পার্টি কাশ্মীরের ব্যাপারে জনসংঘের সাথে একমত নয়। তাদের মতে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের সাথে কথাবার্তা বলা জরুরী ও বিষয়টিতে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপও জরুরী। দীনদয়ালজী এই বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেন নি। তিনি জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির জোট ভেঙ্গে দিলেন, তিনি বললেন—

"আমি মসানিকে ধন্যবাদ জানাই কাশ্মীর প্রসঙ্গে তার স্পষ্ট বক্তব্য রাখার জন্য। তার এই বক্তব্যের কারণে আমি জনসংঘ ও স্বতন্ত্রপার্টির জোট ভঙ্গ করলাম। কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য আমাদের অস্বস্তির কারণ, আমরা এমন কোনও দলের সঙ্গে জোট করতে পারি না যারা দেশের একটি অংশকে আক্রমণকারীদের হাতে তুলে দিতে চায়। আমাদের ভালো-মন্দের জন্য মাসানির উপদেশের প্রয়োজন নেই। দেশের অখন্ডতা আমাদের কাছে শ্রদ্ধার বিষয়। দেশের অখন্ডতা রক্ষায় আমরা যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত।

গোয়া মুক্তি আন্দোলন

একটি স্বাধীন দেশ যারা সম্পূর্ণরূপে উপনিবেশবাদের বিরোধী। কিন্তু স্বাধীনতার পরও সেই দেশের মাটিতে দুটি দেশের উপনিবেশ বর্তমান ছিল এবং দুটি অঞ্চলের স্বাধীনতার দাবীতে সদ্য গঠিত সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করতে হয়েছিল। পন্ডীচেরীতে ফরাসী এবং গোয়া, দমন, দিউতে পোর্তুগাল উপনিবেশের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে জনসংঘের প্রথম অধিবেশনে দীনদয়ালজী সবর হয়েছিলেন।

২মে ১৯৫৪ সাল, দেশ জুড়ে এই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জনজাগরণ কার্যক্রম শুরু হয়। নেহেরু সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিলয় দিবস আয়োজিত হয়। দীনদয়ালজী ইন্দোরে তার বক্তব্যে বলেন—"ফরাসী উপনিবেশের বিরুদ্ধে ভারত এক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করেছে। ভারত সরকারের দেখছি-দেখব নীতি ত্যাগ করে ভারতের বুকে বসে বিদেশী উপনিবেশিকরা যে অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।"

১৯৫৪ সালের ৯ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় জনসংঘ গোয়া মুক্তি সপ্তাহ পালন করে এবং ১৯৫৫ সালের ১৪ এপ্রিল পুর্তুগালের হাত থেকে গোয়া মুক্তির দাবিতে 'গোয়া মুক্তি সমিতি' গঠিত হয় ও জনজাগরণের কার্যসূচি ঘোষিত হয় সারা দেশে। ২৩শে জুন ১৯৫৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবসে গোয়াতে 'সত্যাগ্রহের' কার্যক্রম গৃহীত হয়। ভারতীয় জনসংঘের তৎকালীন সম্পাদক জগন্নাথ রাও যোশীর নেতৃত্বে ১০১ জন সত্যাগ্রহী ঐদিন গোয়াতে প্রবেশ করেন। তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে পর্তুগাল পুলিশ। মধ্যপ্রদেশের শ্রী রাজাভাউ মহাকাল ও উত্তর প্রদেশের শ্রী আমিরচাঁদ গুপ্তার প্রাণ যায় এই অত্যাচারে। দীনদয়ালজী এই সত্যাগ্রহ সংগঠিত করতে সারা দেশে প্রবাস করেন। সমাজবাদী দল এই সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু ভারতের অন্য রাজনৈতিক দল বিশেষ করে কংগ্রেসের ভূমিকা এই সত্যাগ্রহে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ছিল। ভারতীয় জনসংঘের কর্মীদের আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে এবং ভারতে উপনিবেশের চিহ্ন সমাপ্ত হয়। স্বাধীন হয় গোয়া।

বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে জন-আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যাগুলির সঠিক ব্যবস্থার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত

হয়। এই চুক্তি অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী অঞ্চল পাকিস্তানকে দিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু জনসংঘের বক্তব্য ছিল—"১৯৫৮ সালে কয়েক মাস ধরে পাকিস্তান কুচবিহার জেলা ও ত্রিপুরার সীমান্তে লাগাতার গুলিবর্ষণ করে ও অসমের তুকের গ্রাম ও ত্রিপুরার লাখিনপুর গ্রাম দুটি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়—এ ব্যাপারে সচিবস্তরীয় কথাবার্তা শুরু হলেও তা ফলপ্রসূ হয় নি। পরে প্রধানমন্ত্রী স্তরে কথাবার্তার পরে ১০ ডিসেম্বর ১৯৫৮ নেহেরু-নুন চুক্তি হয়। কিন্তু চুক্তিপত্রে তুকের ও লখীমপুর গ্রাম দুটির কোনও উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি।

ভারতের মাটি পাকিস্তানকে অবৈধভাবে রাখতে দিয়েছে শুধু নয় সরকার এর থেকেও খারাপ কাজ করেছে। বিভাজনের পরেও নতুন করে সরকার বিবাদস্পদ প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছে। যার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার ইচ্ছামতি নদীর তটবর্তী এলাকা, জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়ন তথা কুচবিহারের টাপুত্তর বিনিময় নিশ্চিত করে ভারতের ক্ষেত্রফল কম করে ফেলে। নেহরু-নুন চুক্তিতে সববিষয় গোপন রাখা হয়েছিল যাতে সাধারণ মানুষ কিছু জানতে না পারে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সভায় ঘোষণা করল তখন বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে এবং পশ্চিমঙ্গের মানুষ-এর বিরোধীতা করে। জনসংঘ দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করল। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা তথা বিধান পরিষদ সর্বসম্মতিতে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করল। তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বিধান সভায় ঘোষণা করলেন এই প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গবাসীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সমান। গনআন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রপতি বেরুবাড়ী হস্তান্তরে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মতামত জানতে চাইল। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় জানাল ভারতের যে-কোন জায়গা কোনও অন্যদেশকে হস্তান্তর করা অসাংবিধানিক। কিছুদিনের মধ্যেই চীন ভারত আক্রমণ করল এবং পাকিস্তান চীনকে সমর্থন করল। এই পরিস্থিতিতে সবাই ভাবল এবার তাহলে বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রস্তাব শেষ হলো। কিন্তু আশ্চর্য, হস্তান্তর

প্রক্রিয়া শুরু হল এবং জনআন্দোলনকে লাঠীচার্জ করে, গ্রেফতার করে দাবানোর চেষ্টা হলো।

দীনদয়ালজী সরকারের এই ব্যবহার দেখে বললেন নেহরু স্বৈরাচারী হলেও জনসঙ্ঘ তা মেনে নেবে না।

কচ্ছ চুক্তি ও তাসখন্দ ঘোষণা

কচ্ছ চুক্তি ও তাসখন্দ ঘোষণা (১৯৬৫-৬৬) নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতিরক্ষা নীতির পার্থক্য প্রতিফলিত হয়। পাকিস্তানকে প্রথম আক্রমণের উত্তর প্রত্যাক্রমণের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী, পাকিস্তান সীমান্ত পুলিশ গুজরাটের কচ্ছ এলাকাতে অনুপ্রবেশ শুরু করে। ১৭ মার্চ ভারত সীমান্তের ১৩০০ গজ ভিতর কঞ্জরকোট দখল করে। ২৫ মার্চ ডিঙ্গ অধিকার করে যেখানে ভারতের সীমান্তে সীমা পুলিশ ৬ মাইল পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান সেনা ভারত সীমান্তের আরও ভিতরে ঢুকতে থাকে। ৯ এপ্রিল সরদান চৌকী ও হঙ্গোকৌটর উপর আক্রমণ শুরু করল। তখনও পর্যন্ত ভারত সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কেবল সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতেই ছিল। দেশের মানুষের ক্ষোভের কারণে কচ্ছের সুরক্ষার দায়িত্ব সেনার হাতে দেওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানি সেনা পিছু হটতে শুরু করে। ফলে ১৪ এপ্রিল ১৯৬৫ যুদ্ধ বিরাম তথা আলোচনার শর্ত রাখে। ভারত সরকার ঘোষণা করল পাকিস্তান সম্পূর্ণ ভারতীয় সীমান্ত খালি না করা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরাম হবে না।

২৪ শে এপ্রিল পাকিস্তান সীমান্তের পয়েন্ট ৮৪-র উপর আক্রমণ করল। এই আক্রমণে আমেরিকার সাথে সৈন্য চুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে আমেরিকার ট্যাঙ্কও ব্যবহার করল। এ ব্যাপারে আমেরিকার দৃষ্টিপাত করালেও ওরা তা উপেক্ষা করে প্রচুর আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করল।

যখন ভারতীয় সেনা শত্রু মোকাবিলায় প্রত্যাক্রমণের জন্য জমায়েত হতে লাগল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইলসন এর অনুরোধে নেহেরু যুদ্ধবিরাম মেনে নিল।

পাকিস্তানের সঙ্গে কচ্ছ চুক্তি সাক্ষরিত হল। দীনদয়ালজী তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। এই চুক্তির বিরুদ্ধে তথা কচ্ছে সেনা অভিযানের পক্ষে ভারতীয় জনসংঘ ব্যাপক জনজাগরণ করে। ৬ আগস্ট ১৯৬৫ দীনদয়ালজী ও বচ্ছরাওজী ব্যাস এর নেতৃত্বে ভারতীয় সংসদের সামনে বিশাল জনসমাবেশ হয় যেখানে ৫ লক্ষ লোক জমায়েত হয়েছিল। ফলস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ২০ আগস্ট ১৯৬৫ পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। জনসংঘ তার প্রস্তাবে ঘোষণা করল যদি জনতা এমন জাগ্রত থাকে তবে কচ্ছ চুক্তি শুধুমাত্র সাদা-কাগজ হয়েই থাকবে।

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৬৫ তাসখন্দ ঘোষণা

এতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির চাপে পাকিস্তানে-র লাভই হত। এই প্রথম ২০ আগস্ট বৈঠক বন্ধ হবার কারণে পাকিস্তান ধাক্কা খেল এবং কচ্ছ চুক্তি বেকার হয়ে গেল। পাকিস্তান কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে বড় ধরনের অন্তর্ঘাত করতে চেয়েছিল। ভারতীয় সেনা সেই চক্রান্ত ভেস্তে দিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে সব রাস্তা বন্ধ করে দিল। ২৫ আগস্ট ভারতীয় সেনা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে হাজীপীরদর পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ পাকিস্তান ছম্বা সেক্টরে ট্যাঙ্ক ও ভারী গোলাবারুদ সহ আক্রমণ শুরু করল। প্রমাণিত হল বড় যুদ্ধের জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত। ৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান অমৃতসর আক্রমণ করল। ৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনা লাহোর তথা শিয়ালকোট পর্যন্ত এগিয়ে যেতে থাকল। জনসংঘ যে দাবি করে আসছিল তা এতদিনে প্রমাণিত হল। ৬ সেপ্টেম্বর লালবাহাদুর শাস্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠকে দীনদয়ালজী তথা সরসংঘচালক শ্রীগুরুজীকেও আমন্ত্রণ জানালেন। জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একাত্ম হয়ে যুদ্ধে সর্বপ্রকার সহযোগিতার কথা ঘোষণা করল।

পাকিস্তানের সাথে ২২ দিনের এই যুদ্ধকে দীনদয়ালজী স্বাধীনোত্তর

ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রূপে আনন্দের সাথে বর্ণনা করেন। সেনাবাহিনী এবং দেশবাসী সাহস, ধৈর্য্য, কৌশল এবং বীরত্বের সাথেই কাজ করেছে। এর থেকে দেশ নিজের শক্তি ও দুর্বলতার দিকটি অনুভব করতে পারল। শত্রু এবং মিত্র চিনতে পাড়ল। ভারতীয় জনসংঘের বিচারধারা দেশের বিচারধারায় পরিণত হল।

রাষ্ট্রসংঘ শান্তির নামে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী করল। ভারত নিজের দেশে পাকিস্তানি আক্রমণ চলা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করবে না জানিয়ে দিল। ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ-র চাপে ভারত যুদ্ধ বন্ধ করেছিল কিন্তু ১৬ বছর ধরে পাকিস্তান ভারতের জায়গা দখল করেছিল, রাষ্ট্রসংঘ কিছু করেনি। ভারতীয় জনসংঘ পাক দখলীকৃত কাশ্মীর পুনঃরুদ্ধার ছাড়া সরকার যাতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না করে তার জন্য দেশবাসীর চাপ সরকারের উপর বাড়াতে থাকল।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর চাপে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির তাসখন্দে এক শিখর সম্মেলনের দিন স্থির হলো। দীনদয়ালজী এই সম্মেলনের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীগুরুজী সারা দেশব্যাপী প্রতিটি সভাতে বলতে থাকলেন শ্রী শাস্ত্রী যেন তাসখন্দ না যান। ঘটনা আটকানো গেল না। ১০ জানুয়ারি ১৯৬৭ তাসখন্দ ঘোষণায় লালবাহাদুর শাস্ত্রী তথা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মহঃ আয়ূবখানের হস্তাক্ষর সাক্ষরিত হল। ঐদিন রাত্রেই তাসখন্দে শাস্ত্রীজীর রহস্যময় মৃত্যু হয়।

ঘোষণায় লেখা হলো ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান সহমত হয়েছেন দুই দেশের সেনা ৫ আগস্ট ১৯৬৫র জায়গায় ফেরত চলে যাবে। এই কাজ ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬-এর পরে হবে না। দুটি দেশই যুদ্ধবিরাম রেখাতে যুদ্ধবিরাম স্থিতি পালন করবে।

অর্থাৎ কাশ্মীরের যে ভূখণ্ডকে মুক্ত করানো হয়েছিল ভারত তা আবার পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দেবে। শাস্ত্রীজী যদি জীবিত অবস্থায় ভারতে আসতেন তাহলে জনসংঘ কালো পতাকা দিয়ে স্বাগত করত। দীনজয়ালজী তাসখন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাত' নামে বই

লিখলেন। দীনদয়ালজী খুবই দুঃখ পেলেন এত সংগ্রাম করেও ভারতের মাটি থেকে পাকিস্তানের আক্রমণ সমাপ্ত করা গেল না। যুদ্ধের সময় দীনদয়ালজী লালবাহাদুরকে রাষ্ট্রীয় নায়ক-র মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাসখন্দ ঘোষণার পরে জয় জওয়ান জয় কিষান স্লোগান সম্পর্কে বলেন জয় জওয়ান মন্ত্র তাসখন্দে ভুলে গেলাম আর আমেরিকার গম পেয়ে জয় কিষাণ-র মন্ত্রও চলে গেল। এই প্রবৃত্তি ঠিক নয়।

দীনদয়ালজী ভারতকে পরমাণু শক্তিধর দেশ বানাতে চাইতেন। তাঁর মত ছিলো আমাদের পরমাণু অস্ত্র না তো বিশ্ব শান্তির অন্তরায় না আমরা বিশ্বশান্তির ঠিকেদার। বিশ্ব ধ্বংসের জন্য যত বোমা দরকার আমেরিকা বা রাশিয়ার কাছে তার থেকে অনেক বেশি পরমাণু বোমা আছে। কিন্তু এখনও যুদ্ধ হয়নি। তাই কংগ্রেস সরকার বিশ্বশান্তির ভার ঈশ্বরের উপর দিয়ে পরমাণু অস্ত্র তৈরির কাজ আরম্ভ করুক। সৌভাগ্যবশত দীনদয়ালজীর মন্ত্র শিষ্য অটলজী ১৯৯৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন এবং ভারত দ্বিতীয়বার পরমাণু পরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রকৃত পক্ষে পরমাণু শক্তি সম্পন্ন দেশে পরিণত হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন

দেশের আভ্যন্তরীণ অখণ্ডতা বিষয়ে পণ্ডিত দীনদয়ালজীর মত ছিল সংঘাতময় সংবিধান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতে বিকেন্দ্রীকৃত একাত্মশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন। সংঘাত্মক ব্যবস্থা স্বীকার করার জন্য আমাদের দায়িত্ব এসে পড়েছে সঙ্ঘ সদস্য রাজ্য নির্মাণ করার। ভাষাগত রাজ্য তৈরির সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে হয়েছে, যার জন্য অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। এর সমালাচনায় দীনদয়ালজী বলেছেন—'একটি প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ার জন্য যে তত্বের মাহাত্ম আছে তার মধ্যে ভাষাও আছে কিন্তু এটা ঠিক নয় যেসব ভাষাই একমাত্র কারণ। প্রশাসনে ভাষার একটি মহত্মপূর্ণ স্থান আছে যার কারণে ভাষাগত সীমানা প্রদেশের সীমানায় রুপ নিয়েছে। কিন্তু এর থেকে ভিন্ন রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। জনসংঘ এটাকে ঠিক মনে করে না।

তিনি দাবী করেন প্রান্ত রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করার। প্রদেশকে রাজ্য বলারও বিরুদ্ধে ছিলেন দীনদয়ালজী। দীনদয়ালজীর মত অনুসারে ভারত একই রাজ্য। অনেক রাজ্যের সঙ্ঘ নয়। তাই তিনি মত ব্যক্ত করতেন সঙ্ঘরাজ্য এবং রাজ্যের স্থানে ক্রমশ প্রদেশ শব্দের প্রয়োগ করতে হবে। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম কানপুর অধিবেশনে প্রদেশ পুণর্গঠন জন্য প্রস্তাব পাশ করা হয়।

১৯৫৪-এ রাজ্য পুণর্গঠন আয়োগ তৈরী হয়। দীনদয়ালজী আয়োগকে এক বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়ে শুধুমাত্র ভাষাই মাপকাঠি নয় অন্য বিষয়েও গুরুত্ব দিতে বলেন। এই বিষয়ে বলেন—যদি বম্বেতে একজনও মহারাষ্ট্রীয় না থাকে তথাপি বম্বেকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তদরূপ কলকাতায় একজনও বাঙালি না থাকলেও কলকাতাকে বাংলারই অঙ্গ মানতে হবে। ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে। ওখানকার লোক কি বলছে সেটা মানতে রাজি নই। আমরা সব সময় ছোট ছোট বিষয়ে জনমত নিতে থাকবো? দেশে একই রাজ্য চলবে। সারা দেশে আয়োগের সামনে অনেকে প্রস্তাব দিয়েছে। নিজের মতন করে রাজ্যের সীমা নির্ধারণের মত প্রকাশ করেছেন। যখন আয়োগ সরকারকে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন জনসংঘ প্রতিবেদনকে সমর্থন করেছে। অনেকে এটাকে জনসঙ্ঘের প্রতিবেদন বলেও কটাক্ষ করেছেন।

দীনদয়ালজীর মত ছিল আয়োগের প্রস্তাব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবে রূপদান করা। কিন্তু সরকার ঘোষণা করল—রিপোর্টের উপর সরকার তথা বিধান মণ্ডলের রায় নিয়ে অন্তিম ফয়সালার জন্য সংসদে পেশ করা হবে। দীনদয়ালজীর মত ছিল, সংসদ সর্বক্ষমতা সম্পন্ন তাই তারই নির্ণয় নেওয়া উচিত। তা না করার পরিণাম দেশে প্রান্তবাদ, ঝগড়া, হিংসার ছায়ায় ভারতে তথাকথিত ভাষা ভিত্তিক রাজ্যের সৃষ্টি হল।

ভাষা-নীতি

ভারতের মত বহু ভাষা-ভাষী তথা বিশাল দেশের ভাষা নীতি ঠিক

করা একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সারা দেশে কখনও একটি মাত্র ভাষা ছিল কিনা সেই উত্তরটাও দেওয়া কঠিন। ভাষাবিজ্ঞানের আধারে আর্য্যভাষা, দ্রাবিড় ভাষা, দক্ষিণের ভাষা আবার সংস্কৃত ভাষা এসবের মধ্যে দীনদয়ালজীর স্পষ্ট মত, সম্পূর্ণ ভারতে বিদ্বান তথা পন্ডিত ব্যক্তিরা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করতেন। মুসলিম আক্রমণের সময় আরবি লিপিতে লিখিত পার্শি ভাষা আধারিত উর্দু, পরে ইংরেজ আসার ফলে ইংরেজি ভাষা, দুটিই আমাদের অপমানের প্রতীক। সংস্কৃত নিষ্ঠ হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার সম্ভাবনা থাকলেও প্রাদেষিক ভাষার গুরুত্ব তথা ইংরেজির আধিপত্যে তা সম্ভব ছিল না। দীনদয়ালজী ভাষা বিবাদ নিয়ে আজীবন সক্রিয়ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। অনেক বিষয়ে তিনি সমঝোতাও করেছেন। ভাষাকে রাজনীতির মাধ্যম করাতে ভাষা সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের অনেক ক্ষতি হয়েছে ও হিন্দীর বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। দীনদয়ালজীর স্পষ্ট মত ছিল রাজনৈতিক নেতারা ভাষা নিয়ে রাজনীতি করে লাভ তুলতে পারেন কিন্তু নুতন ভাষা সৃজন করতে পারবেন না।

হিন্দীর সীমাবদ্ধতা ও ইংরেজীকে নিত্য ব্যবহারিক ভাষা করার ব্যপারে তাঁর স্বাভিমানি মত ছিল, আমারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বলেছি স্বরাজের (Self Rule) চাহিদা সুরাজ (Good Rule) দিয়ে মেটান যায় না তেমনি স্বভাষার স্থান কখনও সুভাষার দ্বারা পূরণ সম্ভব নয়।

দীনদয়ালজী সম্পর্ক তথা রাষ্ট্রীয় ভাষাকে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার দৃষ্টি দিয়েই দেখতেন। তাঁর মত ছিল ভারতের প্রাচীনতম ভাষা সংস্কৃতকে সাংবিধানিক রাষ্ট্রভাষা তথা হিন্দিকে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ভাষা রূপে বিকশিত করা হোক। তিনি হিন্দির প্রবল সমর্থক ছিলেন। ১৯৫৭ ব্যাঙ্গালোরে ও একদশক পর ১৯৬৭ কালিকট অধিবেশনে হিন্দীর সীমাবদ্ধতা নিয়ে তিনি মতব্যক্ত করেন। ভাষা আমাদের উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত করে দিক সেই রাজনীতি তিনি চান নি। ইংরেজীর বিকল্প ভারতীয় ভাষার খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু নিয়তি তাকে অকালেই আমাদের কাছ থেকে টেনে নিল।

গণতন্ত্রের অগ্রদূত

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির আধারেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের যে ধারণাকে সকলের সর্ব-সম্মত মনে হত, দীনদয়ালজী তাকে অনুসরণ করতে রাজী ছিলেন না। পাশ্চাত্যের রাজ্য গঠন পরিকল্পনা, পাশ্চাত্যের সেকুলারিজম, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র তথা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধরনের মতবাদ সবগুলি ভারতীয়তার কষ্ঠিপাথরে বিচার করতেন ও সেগুলির ভারতীয় করণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন গণতন্ত্র পশ্চিমের দান নয়, ভারতের রাজ ঘরানার মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে গণতন্ত্রের প্রভাব আছে—তিনি লিখেছেন—

বৈদিক সভা এবং সমিতি-র গঠন গণতন্ত্রের অধিকারেই হত। মধ্যযুগের অনেক রাজ্যই সম্পূর্ণ গণতন্ত্রমুখী ছিল। রাজতন্ত্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা রাজার মর্যাদা সীমিত করে শুধু প্রজানুরাগীই নয় প্রজাঅনুগামী করতে চেয়েছি। এই মর্যাদার ভঙ্গকারী অনেক রাজার উদাহরণ অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ধরনের রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ এবং সেই ধরনের শাসককে আদর্শ শাসক না বলে নিম্ন শ্রেণীর শাসক বলে বিবেচনা করা হত। এর থেকে আমাদের মৌলিক গণতন্ত্রের ভাবনার প্রমাণ হয়। দীনদয়ালজী বলতেন, গণতন্ত্রের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, এটি ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যেই চলতে থাকা একটি পথ। আমাদের এখানে একটি প্রাচীন উক্তি হল—"বাদে বাদে জায়তে তত্ব বোধা।" কিন্তু যদি অন্যদের দৃষ্টিতে না দেখে আমাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করি তবে দেখব 'বাদে বাদে জায়তে কণ্ঠশোষা', এই উক্তিই সঠিক হবে। ওয়াল্টেয়ার বলেন—"আমি তোমার কথা সত্য বলে মনে না করলেও তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করব"। সেই পর্যায়ে তিনি কণ্ঠশোষার কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি তারও আগে গিয়ে বাদ-বিবাদকে তত্ববোধ রূপে অনুধাবন করেছে।

পশ্চিমে গণতন্ত্রের উত্তোরনের ও তা পুঁজিবাদের রূপে বিকৃত হয়ে যাওয়া ও কার্লমার্কসের একনায়কতন্ত্রবাদকে দীনদায়ালজী বিস্তৃতরূপে পর্যালোচনা করেছিলেন।

"গণতন্ত্রের ভারতীয়করণ"

দীনদয়াল উপাধ্যায় গণতন্ত্রের তাত্বিক অবধারনার সাথে একমত হয়েও পাশ্চাত্যের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উৎপন্ন পুঁজিবাদ সম্বলিত ও সর্বক্ষমতা সম্পন্ন রাজসত্তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া রূপে উঠে আসা গণতন্ত্রের ভারতীয় করণ চাইতেন, গণতন্ত্রের ভারতীয়করণ করার আহবান জানিয়ে ছিলেন।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া 'নির্বাচন' বিধি প্রদান করেছে। সংবিধান, প্রশাসন, বিধি ও ন্যায়পলিকা তৈরি করেছে কিন্তু এগুলি কেবলমাত্র গণতন্ত্রের বাহ্যিকরূপ। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের আত্মা তার বাহ্যিক রূপে নয়, জনগণের চাহিদা প্রকৃত রূপে প্রকাশের মধ্যেই আছে, জনাকাঙ্খার প্রকৃত প্রতিফলনের মধ্যে আছে। গণতন্ত্র কোন বাইরের কাঠামোর উপর তৈরী হয় না। ভোটিং বা মতাধিকার প্রয়োগ বা নির্বাচন পদ্ধতি গণতন্ত্রের একটি বড় অংশ, কিন্তু এগুলি হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাশিয়াতে এগুলির সবই আছে কিন্তু রাজনৈতিক পন্ডিতগণ তাকে গণতন্ত্র বলেন না। মতাধিকার বা নির্বাচনের সাথে সাথে আরও একটি ভাবনা গণতন্ত্রের জন্য একান্ত জরুরী। কেবলমাত্র বহুমতের শাসনই গণতন্ত্র নয়, এমন তন্ত্রে জনতার একটি অংশের আওয়াজ সত্য হলেও তাকে দাবিয়ে রাখা হবে। গণতন্ত্রের এই স্বরূপ 'সর্বজন সুখায়, সর্বজনহিতায়, হতে পারে না। সেই কারণে ভারতীয় গণতন্ত্রের কল্পনায় নির্বাচন, বহুমত, অল্পমত ইত্যাদি বাইরের ব্যবস্থার পরিবর্তে সমস্ত মতের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, বিরুদ্ধ মতের একজন ব্যক্তি থাকলেও সেই মতামতের গুরুত্বই শুধু নয় নিজেদের কাজে তার প্রয়োগও ঘটাতে হবে।

যেখানে আজকের গণতন্ত্রের সর্বাধিক সাফল্য এসেছে সেই ইংল্যান্ডে বিরোধী দলনেতাকে সরকার বেতন দেয়। খেলার জন্য যেমন দুটি পক্ষ হওয়া জরুরী তেমনই সংসদেও দুটি দলের প্রয়োজন। শাসক দলের বিভিন্ন নীতির ভুলত্রুটি বিরোধী দল তুলে ধরে।

নির্বাচনী সংস্কারের একান্ত ইচ্ছা

দীনদয়ালজী মনে করতেন নির্বাচনের তাৎকালিক নির্ণয় বহুমতের দিকে গেলেও কিন্তু মানুষের রায় কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কমসংখ্যার বিচারের স্বাধীনতার মধ্যে ঠিক ভাবে প্রকাশ পায় না। এর মাধ্যমে দলীয় কোন্দল এবং সমাজের মধ্যে স্থায়ী কলহ নির্মাণ হয় সেই কারণে গণতন্ত্রে কেবলমাত্র বহুমতের শাসন বা কমসংখ্যার শাসন নয় এ কেবল মাত্র জনতার তাৎকালিক ইচ্ছার শাসন। জনতা তার তাৎক্ষণিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারে না। যখন এই সাধারণ ইচ্ছাই সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে তখনই 'গণতন্ত্র' ভীড়তন্ত্রে বদলে যায়। খারাপ লোকেরা এটার ব্যবহার করে। জুলিয়াস সীজার নাটকের উদাহরণ দিয়ে দীনদয়ালজী বলেছেন —যে জনতা ব্রুটাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে জুলিয়াস সীজার হত্যার উৎসব পালন করছিল সেই জনতাই এন্টনীর ভাষণে উত্তেজিত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রুটাসকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল। Mobocracy (জনতার দ্বারা শাসন) ও Autocracies (একনায়কতন্ত্র) এই দুই ধারণার মধ্যে গণতন্ত্রকে জীবিত রাখা খুবই কষ্টকর। সেই কারণেই জনচেতনার যথাযথ বিকাশের প্রয়োজন হয়। এটাকেই দীনদয়ালজী প্রাচীন ভারতের লোকমত-পরিষ্কার পদ্ধতি বলেছেন। লোকমত পরিষ্কার একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। যেখানে যেখানে সাম্যবাদী বা স্বৈরতন্ত্রী শাসকগণ রাজনীতিক ক্ষমতার মাধ্যমে ব্রেন ওয়াশিং বা বিরোধদের সর্বপ্রকার অধিকার কেড়ে নেবার মতো অমানবিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে তেমনই গণতন্ত্রে এই বিষয়ে হয় অরাজকতা রয়েছে অথবা সরকারী প্রচার যন্ত্রকে এর মাধ্যম তৈরী করা হয়েছে।

দীনদয়ালজীর মত—ভারত এই সমস্যার সমাধান করেছে রাজ্যের হাত থেকে লোকমত নির্মাণের মাধ্যম কেড়ে নিয়ে। লোকমত পরিষ্কারের কাজটা করতেন বিতরাগ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা। লোকমতের ইচ্ছাতে রাজ্য চলত। সন্ন্যাসী সর্বদা ধর্মতত্ব অনুসারে জনতার জাগৃতির এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনায় ধর্মের মর্যাদার কথা স্মরণ করাতেন। তাঁদের সামনে কোনও লোভ, মোহ না থাকার কারণে সত্য কথা বলতে কোনও ভয় করতেন না। শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমেই সমাজে জীবন মূল্য নির্মাণ ও তা সুদৃঢ় করা সম্ভব। এই জীবন মূল্যরূপী বাঁধের কারণে লোকইচ্ছার নদী কখনও নিজের তটকে অতিক্রম করে সমাজে সংকট তৈরী করত না। দীনদয়ালজীর লোকমত পরিষ্কার ভাবনা এমনই ছিল যেমন গণতান্ত্রিক জনচেতনার নির্মাণের জন্য কিছু মানুষ পাশ্চাত্যে 'Be educate over masters' আন্দোলন চালিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য দীনদয়ালজী যে মনোভাব রাখতেন তার মধ্যে অন্যতম হল—

(১) সহিষ্ণুতা ও সংযম (২) অনাশক্ত ভাব (৩) আইনের শাসনের প্রতি সম্মান রাখা।

এর মানসিক প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে দীনদয়ালজী বলেছেন লোকমত-পরিষ্কার সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হোক, তার জন্য কার্যকর্তাদের তিনি আহ্বান করেছিলেন। দীনদয়ালজী কেবলমাত্র শিক্ষিত, বিদ্বান বা দার্শনিক ছিলেন না, প্রত্যক্ষ রাজনীতিক ক্ষেত্রের একজন কার্যকর্তাও ছিলেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার মাত্র নয়, বরং সামাজিক সহভাগিতার মাধ্যমরূপে ব্যবহারের জন্য তিনি ভালো প্রার্থী, ভালো দল এবং ভালো মতদাতা (ভোটার) কেমন হবে সেই বিষয়ে তাঁর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন যাতে তিনি রাজনেতা নয় একজন রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন।

ভালো প্রার্থী—তাঁর মতে একজন উপযুক্ত প্রার্থী তিনিই যিনি বিধানসভায় নিজের দলের প্রতিনিধিত্ব করার সাথে সাথে নিজের ক্ষেত্রের ভোটারদের মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত। একজন ব্যক্তি হিসাবে

ভোটারদের কাছে তিনি বিশ্বাসী হবেন এবং যে দলের সদস্য হিসাবে তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দলের অনুশাসন পালনের সাথে সাথে উদ্দেশ্যপূর্তি ও সমর্পণের ভাবও রাখবেন।

জনতা ও দলের প্রতি সমর্পিত নিষ্ঠাই একজন ভালো প্রার্থীর উপযুক্ত পরিচয়। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে প্রার্থী চয়ন প্রক্রিয়া ভালো প্রার্থীর বদলে রেস জেতার ঘোড়া'র চিন্তা। বলতে বাধ্য হচ্ছি দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে সম্ভবত এমন রাজনৈতিক দল নেই যারা এই কথা চিন্তা করে। তাদের মাথায় একটা চিন্তাই প্রবল হয় তার প্রার্থী কিভাবে ভোটের লড়াইয়ের জয়ী হবে। তাকেই প্রার্থী করে যার জয়ের সম্ভাবনা সর্বাধিক।"

দীনদয়ালজী ভোটারদের সাবধান করেছেন এই বলে "আমাদের মনে রাখতে হবে কোনও খারাপ প্রার্থীর ভোট পাওয়ার কোনো অধিকার নেই— কোনও ভালো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও। এমনও হতে পারে ঐ ব্যক্তিকে প্রার্থী করার সময় দল তার নিজের লাভের কথাই মনে রেখেছে পরে অনুভব করেছে তাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। এই সময় ভোটারদের দায়িত্ব তারা সঠিক নির্ণয় নিয়ে এই ভুলটির সংশোধন করবে।

ভালো দল—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কোন সমাজ কতটা গণতান্ত্রিক তা সেই সমাজের রাজনৈতিক দলগুলিকে দেখেই বোঝা যায়।

দীনদয়ালজীর মতানুসারে শ্রেষ্ঠ দলের লক্ষণ হল যারা ক্ষমতা পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের গোষ্ঠী না হয়ে জীবন্ত সংগঠন হবে? যারা ক্ষমতা প্রাপ্তি ব্যতিরেখে নিজেদের বৈশিষ্ট বজায় রাখবে।

এই দলের দৃষ্টিতে ক্ষমতা দখল উদ্দেশ্য না হয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমকে কার্যান্বিত করার সাধন হবে। এইজন্য সেই দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারী থেকে অতি সাধারণ সদস্য পর্যন্ত নিজেদের আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠাবান হবে। এই নিষ্ঠাই অনুশাসন এবং

আত্মসমর্পণের ভাবনা উৎপন্ন করে, যদি অনুশাসন উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তা দলের আভ্যন্তরিন শক্তিহীনতাই প্রকট করে।

দীনদয়ালজী দুঃখের সঙ্গে বলেন, ভারতের রাজনৈতিক দল কেবল নামের জন্যই দল। দলের আভ্যন্তরীন শক্তিহীনতা তাকে সমাজের অবাঞ্ছনীয় শক্তিকেই অবলম্বন করতে বাধ্য করে। দীনদয়ালজী বিশেষ সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন ১. রাজা-মহারাজা, ২. জাতপাত, ৩. ব্যবসায়ী।

রাজা-মহারাজা—ভারতের রাজনৈতিক দল তখনও পর্যন্ত তার শিকড় জনতার মধ্যে বিস্তার করতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলিকে একদিকে রেখে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে হয় কারণ আজও পুরাতন রাজা মহারাজা নবাব জায়গিরদারদেরকে নিজেদের দলে আকর্ষণের প্রয়াস চলে। আমি এই কথা স্বীকার করি এই পুরাতন বর্গকেও দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় করতে হবে কিন্তু প্রার্থীপদ দেবার জন্য তার রাজকুলে জন্ম না হয়ে তার যোগ্যতাই মাপকাঠি হওয়া উচিত।

জাতপাত -জাতি ও সম্প্রদায়ের বিচার প্রার্থী নির্বাচনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। ভারতে প্রতিটি ব্যক্তি কোন না কোন জাতিভুক্ত। অতএব অন্য প্রার্থীর জাতি নিয়ে সংকীর্ণ কথা প্রচার করলে অজান্তেই জাত-পাতের ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে। এর সমাধানের উপায় হল দলীয় সংগঠন শক্তিশালী করলে জাত-পাতের আধারে ভোটারদের কাছে ভোটদেবার আবেদন করার প্রয়োজন হবে না।

শিল্পপতি—প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থীর আর্থিক স্থিতি এবং নির্বাচন ক্ষেত্রে অর্থ খরচের ক্ষমতা অন্যতম বিচার্য হয়।

অনেক ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হয় তার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে। প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের ব্যক্তিরা মানুষের ভোট চাওয়ার বদলে ভোটার ও রাজ্যনৈতিক দলগুলিকে কিনতে চায়। আসলে সংসদের সদস্য হওয়া তার ব্যক্তি স্বার্থ পূরণের মাধ্যম হয়। কংগ্রেস সহ প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল অর্থাভাবের কারণে জেতার জন্য এদের শরণাপন্ন হয়।

ভালো ভোটার—দীনদয়ালজীর মত হল ভোটারদের বুদ্ধিমত্তাই এর সমাধান। এ সকল এমনই তথ্য যা রাজনীতিকে ভুল দিশায় নিয়ে চলেছে। যারা দেশের প্রমুখ রাজনীতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের সিদ্ধান্তকে হত্যা করা উচিৎ নয়। এরকমই জনতার উচিত জাগরুক ভোটার হিসাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হাঁসের মত জল দুধ পার্থক্য নির্ণয় ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাতে রাজনৈতিক দলগুলির ভুল সিদ্ধান্তকে শুধরাতে পারে। এর জন্য দীনদয়ালজী ভোটারদের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখার জন্য আগ্রহ করেন।

১। নিজের ভোটাধিকার পার্টির জন্য নয় সিদ্ধান্তের জন্য, ব্যক্তির জন্য নয়, পার্টির জন্য, অর্থের জন্য না করে ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা।

২। প্রচারের শিকার হয়ে এমন কোন ব্যক্তিকে ভোট দেন যে বিজয়ী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তাতে নির্বাচনী পরিণাম যাইহোক তা নিজের পরাজয়ই বলতে হবে।

৩। ভোটাধিকার নিজের সদ্‌বিচার এবং সদ্‌বিবেকের আধারে উদাসীনতা মুক্ত হয়ে তাকে বিক্রয় না করে, তাকে নষ্ট হতে না দেওয়া।

৪। ভোটাধিকার প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনতার প্রতীক, এজন্যই লোকতন্ত্রবাদী হওয়ার জন্য এর প্রয়োগ কোন নির্দেশে না করে নিজের সদ্‌বিবেক এবং অন্তরাত্মার আহ্বানেই করা উচিৎ।

৫। জনগণের সদা সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে সেই রাজনৈতিক দলের নির্মাতা।

দীনদয়াল উপাধ্যায় একটি রাজনৈতিক দলের মহামন্ত্রী ছিলেন। তবুও তাঁর বিচার দলবাদের উর্দ্ধে উঠে এক গণতান্ত্রিকের ব্যক্ত বিচার। ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্র তার রাষ্ট্রীয় একতাকে তখনই অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম যতক্ষণ দেশে গণতন্ত্র থাকবে। প্রখর রাষ্ট্রবাদই তাঁকে নিরপেক্ষ লোকতন্ত্রবাদী তৈরী করেছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের লোকতন্ত্র বিষয়ক বিচার লোকতন্ত্রের পাশ্চাত্য

এবং ভারতীয় চিন্তাধারার পর্যালোচনা করে তাকে ভারতীয়করণ অর্থাৎ লোকমত পরিষ্কার এর বিবেচনা করে ভারতীয় লোকতন্ত্রের বিশেষতায় প্রকাশ। উপাধ্যায়জীর চিন্তা আদর্শবাদী। উনি নিজের বিচারে সমাজশাস্ত্র তথা মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অপেক্ষা নীতিশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। কোন দলে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ নেতা পাওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয়। প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও যিনি আদর্শ আচরণে নীতিশাস্ত্রের মহত্বই সিদ্ধ করেন। সমঝোতাবাদী লোকেরা নীতি ও আদর্শকে তৎকালীন পরিণামের ভয়ে ত্যাগ করেন এই ব্যবহার নীতির নামে স্বার্থপরতাই প্রকাশ। যে স্বার্থপরতার বিষয়ে দীনদয়ালজী সতর্ক করেছিলেন তারই ভীষণ প্রভাব ভারতে আরম্ভ হয়। সেই প্রতিযোগিতাই তাকে হত্যা করেছিল যা ভারতীয় লোকতন্ত্রের বড় ক্ষতি।

আর্থিক চিন্তন

ছাত্রজীবন থেকেই তত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা জানি কিন্তু উচ্চশিক্ষায় তিনি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। হবার পর রাজনৈতিক দলের কার্যকর্তা তিনি অনুভব করলেন স্বতন্ত্র অর্থনীতি ছাড়া কোন স্বাধীন সমাজ তার উপযুক্ত বিকাশ করতে পারবে না। তিনি কোন পূর্ব প্রস্তুত আর্থিক রাজনৈতিক কাঠামো স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। দীনদয়াল উপাধ্যায় এমন এক দলের নেতা ছিলেন যা মূলতঃ সংস্কৃতিবাদী, যা ব্যবহারিক জীবনে পাশ্চাত্য ধারায় চলবার জন্য প্রস্তুত নয়। আধুনিক লোক কল্যাণকারী রাজ্যের চিন্তার সাথে সাথে আর্থিক নীতিশূন্য হয়ে কোন রাজনীতিক দল চলতে পারে না। সামাজিক, আর্থিক নৈকট্য বিনা সাংস্কৃতিক ও ধর্ম আশ্রিত কোন রাজনৈতিক দল রাজনীতিতে প্রাধান্য পায় না। এজন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় যখন দলের নেতৃত্বে এলেন দলকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিতে বিকশিত করার চেষ্টা করেন। অনেক বিস্তৃত লেখার মধ্যে এই বিষয়ের উপর দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ক্রমবদ্ধ রূপে লিখিত তিনটি পুস্তক অধ্যয়নের জন্য পাওয়া যায়।

১। দ্ টু প্লান্স, প্রোমিসেস, পারফরমেন্স, প্রোস্পেক্টস, (দুই যোজনা—বক্তব্য, অনুপালন এবং প্রভাব) ২। ভারতীয় অর্থনীতি–বিকাশের পথ ৩। ডিভ্যালুয়েশন—এ গ্রেট ফল (অবমূল্যায়ন, এক বিরাট ক্ষতি)।

অর্থনীতির ভারতীয়করণ

অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে এবং লেখার সময় বিভিন্ন সময়ে সরকারী সিদ্ধান্তে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। সাধারণত ঃ অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অনুকরণ খারাপ মনে করতেন। আমাদের এবং পাশ্চাত্যের পরিস্থিতিতে অনেক তফাৎ আছে, সেজন্য আমাদের অর্থনীতিকে ভারতীয়করণ করতে হবে।

নিজের এই বক্তব্য বিবেচনায় দীনদয়াল উপাধ্যায় লিখেছেন—দেশের দারিদ্র দূর করতে হবে এতে দ্বিমত নেই, কিন্তু প্রশ্ন এই, গরীবি কিভাবে দূর হবে? আমরা আমেরিকার পথে (পুঁজিবাদ) চলব না রুশের পথে (সমাজবাদ) চলব অথবা ইউরোপীয় দেশের অনুকরণে। আমাদের এটা বুঝতে হবে ওই সকল দেশের অর্থব্যবস্থার যতই প্রভেদ থাকুক তার মধ্যে এক মৌলিক একতা বিরাজমান। সকলে যন্ত্রকেই আর্থিক প্রগতির পথ মেনেছে। যন্ত্রের প্রধান গুণ হচ্ছে কম মানুষের সাহায্যে অধিক উৎপাদন করানো। পরিণাম স্বরূপ এই সব দেশের অধিক উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশে বাজার খুঁজতে হয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ বাদ এরই স্বাভাবিক পরিণতি। এই রাজ্য বিস্তারের স্বরূপ ভিন্ন হলেও রুশ-আমেরিকা তথা ইংল্যান্ড সকলকেই এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। আমাদের স্বীকার করতে হবে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির পথ যন্ত্রের পথ নয়। কুটির শিল্পকে ভারতীয় অর্থনীতির আধার মেনে বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার বিকাশেই দেশের আর্থিক প্রগতি সম্ভব।

দীনদয়ালজী বড় শিল্পের আধারে রচিত অর্থব্যবস্থাকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে উচিত মনে করেননি। কৃষিতে ছোট মালিকানাধীন ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল। ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সাম্যবাদী চীনের কৃষি যোজনার নকল করে সরকারী চাষ এর প্রস্তাব পাশ হয়। দীনদয়ালজী তাকে অবাস্তব তথা অবাঞ্ছনীয় মেনে তার বিরোধীতা করেছিলেন।

উনি দেশে সংগঠিত সমিতি আর্থিক ব্যবস্থায় নিজের মত প্রকাশ করতেন। এই সমস্ত আলোচনা অধ্যয়নকারীর জন্য পাওয়া যায়। যখন সরকার খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় করণের প্রস্তাব করেন দীলদয়ালজী যুক্তিপূর্ণ ভাবে এর বিরোধীতা করেছেন। ১৯৬০ এ PL 480, ১৯৬৩ তে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন এবং ১৯৬৬ তে ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন এরকমই ঘটনা যার জন্য দীনদয়ালজী বৌদ্ধিকভাবে আন্দোলিত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় এবং মানবীয় সমবেদনার সাথে নিজের দৃষ্টিকোণ প্রস্তুত করেছেন। উনি প্রতিবছর সংস্কৃতি আধারিত অর্থনীতির উপরে একটি করে নতুন লেখা লিখতেন।

দীনদয়াল উপাধ্যায় আমাদের পঞ্চবর্ষীয় যোজনার নিয়মিত সমীক্ষক ছিলেন। দীনদয়ালজী ১৯৫৮ সালে দুই পঞ্চবর্ষীয় যোজনার উপর এক গবেষণামূলক বই 'দো যোজনায়ে :- অঙ্গীকার, অনুপালন, প্রভাব' রচনা করেন যা অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিক কর্তৃক গবেষণা মূলক বিষয়।

এই পুস্তক কেবল দুই যোজনাই নয় আর্থিক ব্যবহার, আর্থিক ধারণা, ইতিহাস এবং যুক্তিপূর্ণ সর্বাঙ্গ পূর্ণ পরিসংখ্যান। তথ্যাত্মক, তুলনামূলক এবং ব্যাখ্যাত্মক পরিসংখ্যান এবং সারণী এই পুস্তকে তুলে ধরা হয়েছে যা অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া বুঝতে পারা বা আগ্রহ সহকারে পড়াই কঠিন।

দীনদয়ালজীর লেখা এই বই সম্বন্ধে যজ্ঞদত্ত শর্মা বলেছেন, এই কাজ এতই সুচিন্তিত ছিল যে, সে সময় যোজনা কমিশনের উপাধ্যক্ষ শ্রী জন্নারায়ণ অগ্রবাল এক পরিচয়পত্র প্রকাশ করে বলেন এমন তথ্যসমৃদ্ধ যোজনা সমীক্ষা আমি আগে দেখিনি যা পণ্ডিতজীর এই পুস্তকে আছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনা প্রস্তুতির সময়েই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হয়। স্বাভাবিক ভাবে ভারতের পঞ্চবার্ষিক যোজনায় যদি কোনও এক ব্যক্তির সামগ্রিক প্রভাব থাকে তা নেহরুজীরই ছিল। উনিই এই যোজনার রূপকার ছিলেন। আর্থিক অগ্রগতির উচ্চাকাঙ্খার প্রভাব এই যোজনায় দেখা যায়। জওহর লাল নেহরু ভারতের আর্থিক বিকাশের গতি পৃথিবীর বিকাশের গতির সাথে সামিল করতে চাইতেন। দীনদয়াল

উপাধ্যায় সাধারণ গতির পক্ষপাতি ছিলেন। উনি ধীরগতিতে বিকাশ অধিক রক্ষণশীল এবং কম সমস্যা সৃষ্টিকারী বলে মানতেন। পৃথিবীর অগ্রগতির দৌড়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব আগে দেখানো প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি তাতে সহভাগী হবে এই চিন্তা করা উচিৎ। এর জন্য দীনদয়ালজীর আগ্রহ থাকত সকলের জন্য কাজ পঞ্চবার্ষিক যোজনার প্রাথমিকতা হওয়া উচিত। নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত গতিতে দৌড়ানোর পরিণাম স্বাস্থ্যের উপর যা হয় তাই হয়েছে। চতুর্থ যোজনাও সেরকম অসাধ্য ছিল। দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছিলেন সোনার ডিম দেওয়া মুর্গীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তিনি যোজনা আয়োগ এবং যোজনাকর রূপরেখাগুলির আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি চতুর্থ পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার সমীক্ষা এবং টিপ্পনী আগের তিনটি পরিকল্পনার তুলনায় অনেক ভালোভাবে এবং ক্রমবদ্ধভাবে করেছেন। তিনি এই বিষয়ে পাঞ্চজন্যতে 'যোজনা বদলো' শীর্ষনামে ধারাবাহিক ভাবে পাঁচটা প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলির উপর ভিত্তি করে আমরা দীনদয়ালের বিচারধারা বিশ্লেষণ করতে পারি।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অর্থ

পণ্ডিত দীনদয়াল শুধুমাত্র আর্থিক সমীক্ষকই ছিলেন না, আর্থিক চিন্তকও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কর্মরত দার্শনিক। যারা শুধুমাত্র জীবনের কোন একটা বিশেষ দিককে জীবনের সবকিছুর নিয়ামক মনে করতো, একটা বিষয় বা ঘটনা নিয়ে অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা করত যে জীবনের অন্য বিভিন্ন ঘটনাগুলো উপেক্ষিত হত, সমগ্রতাবাদী দার্শনিক হওয়ার কারণে দীনদয়াল তাদের সঙ্গে সব বিষয়ে সহমত হতে পারতেন না। এই বিষয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল লিখেছেন—'ভারতীয় জনসংঘের সুষ্ঠ অর্থনীতি ছিল। জনসংঘে অর্থনীতির গুরুত্ব ততটাই ছিল, যতটা ভারতীয় সংস্কৃতে অর্থের গুরুত্ব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি জড়বাদী হওয়ার জন্য অর্থপ্রধান। আমরা জড়বাদ এবং আধ্যাত্মবাদ এই দুইয়ের সমন্বয় করতে চাই। সুতরাং জনসংঘ সবসময় সেই সব মানুষ বা দলের কাছে অপছন্দের

হবে যারা অর্থের জন্যে জীবনের প্রতিটি মূল্যকে উপেক্ষা করে চলতে চায়। জনসংঘ হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং শরীর এই তিনেরই সম্মিলিত বিচার করে। এই কারণে অনেকে জনসংঘকে দোষারোপ করে যে জনসংঘ আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করে। মহর্ষি অরবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের কথা বলতে চায় না। আমরা এই উভয় দোষারোপকে স্বাগত জানিয়ে এতটুকুই বলতে চাই যে—সমাজের জন্য অর্থ প্রয়োজন। যাতে মানুষ নিজের ভরণ পোষণ করে অন্য মহৎ কাজের জন্য প্রচেষ্টা করতে পারে। ততটুকু অর্থকেই আমরা গুরুত্ব দিই।

নিজের অর্থনীতির ভাবনা-চিন্তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় "ভারতীয় অর্থনীতি : বিকাশ কি এক দিশা" নামে একটি বই লেখেন। বইটিতে অর্থনীতির আলোচনা করার সাথে সাথে নিজের চিন্তাপ্রসুত 'একাত্ম মানব' এর অর্থায়াম-এর ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছেন। সমাজকে অর্থের অভাব এবং প্রভাব উভয়ই শেষ করে, তার সুউপযুক্ত ব্যবস্থা করাকে অর্থায়াম বলা হয়েছে।

অর্থের মনোবিজ্ঞান

অর্থের অভাব মানুষকে চোরে পরিণত করে। অভাবে করা চুরিকে ভারতীয় শাস্ত্রকাররা অপরাধ বলে মনে করেন না, তারা এটাকে আপদধর্ম বলেন। বিশ্বামিত্র ধর্মের অনেক বাধা অতিক্রম করেছেন, আপদধর্মের সংজ্ঞা দিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রকাররা তাঁর ব্যবহারকে উচিৎ বলে গণ্য করেছেন। সমাজে অর্থের স্থায়ী অভাব হলে চুরিই ধর্মে পরিণত হবে। যদি বহুলোক অভাবগ্রস্থ হয়ে যায় তবে একে অপরের সম্পদ চুরি করবে অর্থাৎ সমাজে অর্থের অভাব এবং অভাবে করা অপরাধ সমাজে ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে। যখন অর্থ বা অর্থের দ্বারা প্রাপ্ত পদার্থে বা তার থেকে প্রাপ্ত ভোগ-বিলাসে আসক্তি জন্মায় সেটাকেই বলা হয় অর্থের প্রভাব। যখন সকলে ধনবান হয়ে যায়, তখন প্রত্যেক কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন বোধ হবে, অর্থের এই প্রভাব প্রত্যেকের জীবনে অর্থের অভাব তৈরি করে দেবে। সর্বে গুণা : কাঞ্চন মাশ্রয়ন্তে।

মালিকানার প্রশ্ন

"সম্পত্তি কার" এটা সভ্য সমাজের আদিকালের প্রশ্ন। সম্পত্তিকে গোটা সমাজচক্রের আধার মেনে নেওয়ার জন্য এই প্রশ্নের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। ব্যক্তিবাদ এবং সমাজবাদের বিচারাত্মক সংঘর্ষ নতুন এক প্রশ্নের জন্ম দেয়—সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকার বা সম্পত্তির উপর সমাজের অধিকার। সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ে এই দ্বন্দ্বকেই দীনদয়াল ভুল বলে মনে করেন।

প্রত্যেক মানুষ সমাজের প্রতিনিধি। সুতরাং সে সমাজের সম্পত্তির একটা অংশের অংশীদার বা সংরক্ষক। তিনি ব্যক্তিকে ধনহীন করার বিরুদ্ধে ছিলেন। মানুষ নিজেই সমাজের অঙ্গ। সুতরাং সে নিজেই সমাজের সম্পদ। তাই সম্পত্তির অমোঘ অধিকার সমাজেরই। কিন্তু সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি সংস্থারূপে রাজ্যকে মেনে নিতে তিনি রাজী নন। এই কারণে তিনি নিজ সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ বা সামাজিক অধিকারের নামে রাজ্যে সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ, দুটোকেই সমান রূপে ভুল বলে মনে করেন। সাধারণ মানুষকে পুঁজিপতিদের অথবা রাজ্যসংস্থার শ্রমিক বা দাসে পরিণত করাকে তিনি মানবতার অপমান বলে মনে করতেন। দীনদয়াল সম্পত্তির উপর ব্যক্তি বা রাজ্য কারোরই অমর্যাদিত মালিকানা স্বীকার করতেন না। তিনি মালিকানার কেন্দ্রীকরনের বিরুদ্ধে ছিলেন। সুতরাং তিনি বিকেন্দ্রীত রাজ্য ও বিকেন্দ্রীত অর্থব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন।

তিনি বলতেন—'সমাজবাদীরা নিজেদের সম্পত্তিকেই শেষ করার কথা বলে। তাদের ব্যবহার এবং সিদ্ধান্ত দুটোকেই সমর্থন করা কঠিন। যদিও সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই "অপরিগ্রহ" এবং "মা গৃধ: কস্যস্বিদ্ধনম্" এর উপদেশ পাওয়া যায়। সাম্যবাদী, যারা নিজ সম্পত্তি এই ভাবনাকেই সমূলে শেষ করে দিতে চায়, তারাই প্রথমে ব্যক্তিগত এবং পরে কিছু কিছু অংশে নিজ-সম্পত্তি বলে স্বীকার করতে শুরু করে। নিজ-সম্পত্তির কারণে মন্দ উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমরা তার বহিষ্কার করতে পারি না। নিজ সম্পত্তির মর্যাদা অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু জনের হাতে পুঁজী কুক্ষিগত হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে রাষ্ট্রীয়করণ বাঞ্ছনীয়।

'কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিপদ খুব কম। কিন্তু ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশী। সুরক্ষা সামগ্রী শিল্পে তো রাষ্ট্রীয়করণ অনিবার্য। এখন প্রশ্ন পুঁজি-শিল্পের। সেটাকেও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়করণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য রাখতে হবে। এখন পুঁজি-শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে। এদের ক্রমিক মূল্যায়ন করা উচিৎ, যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয়করণ সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন পর্যন্ত বড়-শিল্পগুলিকে জোট বাঁধার প্রবৃত্তিকে আটকাতে হবে। যেগুলির জোট হয়ে গেছে, সেগুলি রাষ্ট্রীয় করে নিতে হবে। কুটির শিল্পেও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পুঁজিপতিরা জোট তৈরী করে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন না করে দেয়। জাপানে সম্পত্তি অসমবন্টনের কারণে সেখানকার কুটির শিল্প পুঁজিপতিদেরই নিয়ন্ত্রণ।

পুঁজীবাদী এবং সমাজবাদীরা যেভাবে মালিকানার প্রশ্ন উত্থাপন করে, যেটা তাদের বিভক্তদৃষ্টির পরিচয়। দীনদয়ালের মতে সম্পত্তির 'কর্তৃত্ব'র বদলে কেন্দ্রীকরণ এর প্রশ্ন বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে উপভোগবাদ-এর ধারণার প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে—মালিকানার সাথে অবাধ নিয়ন্ত্রণ এবং ইচ্ছামত ভোগের ধারণা এই বিষয়টাকে ভুল পটভূমিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। কোনো বস্তুর উপর আমার অধিকার হওয়া সত্ত্বেও, আমি সেটাকে আমার নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারি না। সে অধিকার আমার নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মালিকানা এবং উপভোগ, এই দুটি বিষয়কে আলাদা করতে পারছি, ততদিন এর খারাপ দিকগুলোকে আটকানো যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির একটাই ভাবনা হওয়া উচিৎ জিনিসের মালিক আমি, সেটা ভোগ করার অধিকার আমার তখনই থাকবে, যখন সেটা সমাজের হিতের জন্য হবে। যখন রাজ্য মালিকানা গ্রহণ করে নেয়, তখনও তার ব্যবস্থা সেইসব মানুষের দ্বারাই করা হয়। যে মানুষ নিজের জিনিসপত্র নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে ভয় পায় না, সেই মানুষ সমাজের জিনিসগুলিও যে তেমনভাবে ব্যবহার করবে না, এর গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। তার দুর্ব্যবহার বন্ধ করতে দন্ডনীতির প্রয়োজন। তার মালিকানা থাকা সত্ত্বেও সেই নীতি কাজে লাগাতে হতে পারে।

মানুষের নিজস্বতা হরণকারী রাজ্যাধিকার এবং সমাজকে উপেক্ষাকারী ব্যক্তি অধিকার উভয়েরই বিরুদ্ধে ছিলেন দীনদয়াল। এটাকে তিনি মানুষের অসুস্থ অবস্থার পরিচয় বলে মনে করতেন। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি বা রাজ্যের অবাধ নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন ওই অবস্থার উপজাত।

তিনি মনে করতেন—বাস্তবে কর্তৃত্বের অধিকার হল সঠিক মর্যাদা এবং সু-উদ্দেশ্যের জন্য কোন বস্তুর ব্যবহারের অধিকার। সময়ের সাথে সাথে এই সকল অধিকারেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাই আমরা সৈদ্ধান্তিক দৃষ্টি থেকে ব্যক্তি এবং সমাজের বিবাদের মধ্যে যাব না। সম্পত্তির উপভোগ সমাজের হিতের জন্য হয়, ইচ্ছেমত ভাবে না হয়। ট্রাস্টীশিপ, এই ভারতীয় সিদ্ধান্ত গান্ধীজী এবং শ্রীগুরুজী সমাজের সামনে রেখেছেন।

একক ব্যক্তি এবং সমগ্রসমাজ উভয়েরই বোঝা পড়ার মাধ্যমে মানবতার সুখ লুকিয়ে থাকে। তাই তাঁর একাত্ম মানববাদ এর অভিপ্রেত হল সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রিত অধিকার।

আর্থিক লোকতন্ত্র

দীনদয়াল উপাধ্যায় লোকতন্ত্রকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক জীবনের দিক মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উৎকর্ষ যদি সকলের ভোট হয়, তাহলে প্রত্যেককে কাজ দেওয়া আর্থিক গণতন্ত্রের মাপদণ্ড। প্রত্যেককে কাজ-এর অধিকার প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাজ প্রথমত জীবিকার্জনের জন্য এবং দ্বিতীয় ওই ব্যক্তির কাজ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা উচিৎ। যদি কাজের বদলে রাষ্ট্রীয় আয়ের উপযুক্ত অংশ সে না পায়, তাহলে তার কাজ বেগার বলে গণ্য হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নূন্যতম বেতন, উচিৎ বন্টন এবং কোন না কোন রকমের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। তিনি আরো বলেন—আমাদের দৃষ্টিতে বেগার খাটা যেমন কোন কাজের নয়, তেমনি কোন ব্যক্তি যদি তার ক্ষমতা অনুসারে উৎপাদন না করতে পারে, সেটাও কোন কাজের নয়। আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট এক ধরনের বেকারী।

মানুষের উৎপাদন-স্বাধীনতা বা সৃজনকর্মে আঘাতকারী অর্থব্যবস্থাকে

দীনদয়াল অগণতান্ত্রিক বলে মনে করতেন। নিজে উৎপাদনের মালিক না হওয়া শ্রমিক বা কর্মচারী নিজের স্বাধীনতাকেই বিকিয়ে দেয়। আর্থিক স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরস্পর একে অপরের উপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া আর্থিক গণতন্ত্র চলতে পারে না। যে আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন, সেই রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নিজের অভিমত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারবে। নাহলে অর্থস্য পুরুষো দাসঃ (পুরুষ অর্থের দাস হয়ে যায়)।

মানুষের উৎপাদন স্বাধীনতার উপর সব থেকে বড় আঘাত হেনেছে পুঁজিবাদী শিল্প উদ্যোগিকরণ। তিনি এমন উদ্যোগিকরণ চাইতেন যেখানে স্বাধীন, ছোট কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হবে না। আজ যখন আমরা সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা বলি, তখন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিই। এই সংরক্ষণ দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে এবং দেশীয় ছোট শিল্পগুলিকে বড় শিল্পের থেকে দিতে হবে। তিনি অনুভব করতেন পশ্চিমী শিল্পের অনুকরণ ভারতবর্ষের পারম্পরিক শিল্পগুলিকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং বন্ধ করেছে। আমরা পশ্চিমের অনুকরণ করেছি চোখ বন্ধ করে। আমাদের শিল্পের স্বাভাবিক উন্নতি হচ্ছে না। তারা আমাদের অর্থব্যবস্থার অভিন্ন এবং পরস্পরাশ্রিত অঙ্গ নয় উপর থেকে বোঝা চাপিয়েছে।

স্বয়ংসেবী ক্ষেত্রের উন্নতি

দেশের সাধারণ শিল্প বা কারীগরের উপেক্ষাকারী শিল্প অগণতান্ত্রিক পুঁজীবাদ এবং সমাজবাদের নিজ সার্বজনিক ক্ষেত্রের বিবাদকে দীনদয়াল ভুল বলে মনে করেন। এরা উভয়য়েই স্বয়ংসেবী ক্ষেত্রের সর্বনাশ করেছে। আর্থিক গণতন্ত্রের জন্য স্বয়ংসেবী ক্ষেত্রের উন্নতি প্রয়োজন। তার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থার দরকার।

"রাজনৈতিক শক্তিকে প্রজাদের মধ্যে বিকেন্দ্রীভূত করে যেভাবে শাসন সংস্থার নির্মাণ করা হয়, ঠিক সেইভাবে আর্থিক শক্তিকেও প্রজাদের মধ্যে বিকেন্দ্রীভূত করে অর্থব্যবস্থায় নির্মাণ এবং সঞ্চালন করতে হবে।

রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তি তার নিজের রচনাত্মক ক্ষমতাকে প্রকাশ করার সম্পূর্ণ সুযোগ থাকে। ঠিক সেই ভাবে আর্থিক প্রজাতন্ত্রে মানুষের ক্ষমতাকে পদদলিত না করে তাকেও প্রকাশ করার পুরো সুযোগ দিতে হবে। রাজনীতিতে মানুষের রচনাত্মক ক্ষমতাকে স্বেচ্ছাচারিতা যেভাবে ধ্বংস করে, সেইভাবে অর্থনীতিতে বিপুলভাবে করা বৃহৎ শিল্প মানুষের রচনাত্মক ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। সেইজন্যে স্বেচ্ছাচারিতার মত শিল্পও বর্জনীয়।

যন্ত্রচালিত শিল্পের সীমা সম্পর্কে সচেতন করে তিনি একটা সমীকরণে বলেন—'প্রত্যেকের কাজ'-এর সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিলে সম-বন্টন সুনিশ্চিত হয়ে যাবে এবং আমরা বিকেন্দ্রীকরণের দিকে অগ্রসর হব। এই সিদ্ধান্তকে গণিতের সুত্রে এইভাবে রাখতে পারি—

জ গ ক ব য ই

এখানে 'জ' জনের পরিচায়ক 'ক' কর্মের অবস্থা, 'ব' ব্যবস্থার, 'য' যন্ত্রের, 'ই' সমাজের প্রভাবী ইচ্ছা বা ইচ্ছিত সংকল্পকে প্রকাশ করে। 'ই' (ইচ্ছা) এবং 'জ' (জনতা) তো ঠিকই আছে। 'ই' এবং 'জ' এর অনুপাতে 'ক' (কর্ম) এবং 'য' (যন্ত্র) কে ঠিক করতে হবে। কিন্তু শিল্প যদি লক্ষ হয়, তাহলে 'য' সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'য' এর অনুপাতে 'জ' এর ছাঁটাই হয়। 'য'-এর অনুপাতে 'ই' কেও যন্ত্রের অতি উৎপাদনের অনুসরণ করতে হয়, যেটা সর্বদা অবাঞ্ছনীয়। 'জ' কে ছাঁটাই কারী যে কোন অর্থব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। 'ই' কে নিয়ন্ত্রণকারী অর্থব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারী। তাই 'জ' এবং 'ই' কে নিয়ন্ত্রণে 'ক' কে নিয়োগ করতে হবে। সেটাকেই গণাতান্ত্রিক এবং মানবিক অর্থব্যবস্থা বলা যাবে।

বিকেন্দ্রীত অর্থব্যবস্থা

বিকেন্দ্রী অর্থব্যবস্থার জন্য বিকেন্দ্রীত রাজনৈতিক ব্যবস্থাও জরুরী। এই জন্যে দীনদয়াল স্বাবলম্বী সমর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জনপদ ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। আমাদের অর্থব্যবস্থার ভিত্তি আমাদের গ্রাম বা জনপদ হওয়া উচিত। গ্রামগুলিকে ধ্বংসকারী আর্থিকযোজনা ভারতবর্ষকে

ধ্বংসকারী প্রমাণিত হবে। গ্রাম এবং শহরের অসম উন্নতি রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার জন্য ঘাতক। সংসাধন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের কারণে আমরা পুঁজীবাদ এবং তার প্রতিক্রিয়াত্মক দুষ্টচক্রের থেকে বাঁচতে পারব না। তাই আর্থিক গণতন্ত্রের স্থাপনার জন্য ভারতীয় পরিস্থিতিতে বিকেন্দ্রীত অর্থব্যবস্থাই সর্বোত্তম। দীনদয়াল উপাধ্যায় লিখছেন—

.....বিকেন্দ্রীত অর্থব্যবস্থা চাই। স্বয়ংসেবী ক্ষেত্র (Self Employed Sector) তৈরী করতে হবে। এই ক্ষেত্র যত বাড়বে মানুষ তত এগিয়ে যাবে। মানুষের উন্নতি হবে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের কথা ভাবতে পারবে। প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং বিশেষতা বিচার করে কাজ দিলে তার গুণাবলীর উন্নতি হবে। এই বিকেন্দ্রীত অর্থব্যবস্থা ভারতবর্ষই বিশ্ব সংসারকে দিতে পারে। যে ব্যবস্থা ভারি-শিল্প এবং কেন্দ্রীকরণের দুষ্টচক্রে একবার ফেঁসে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনা কঠিন। সেইজন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে গ্রামকেন্দ্রিক ছোট-শিল্প যুক্ত বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে হবে। ছোটশিল্পগুলি আর্থিকদিক থেকে লাভজনক নয় দীনদয়াল এই তত্ত্বের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন না তিনি মনে করতেন বৃহৎ শিল্পে বৃহৎ লাভ ভ্রমমাত্র। বাস্তবে লাভ ছোট শিল্পেই হয়।

.....আসলে সত্য হল লাভ বৃহৎশিল্পে উৎপাদনের জন্য নয়, বেশী পরিমাণে উৎপাদনের কারণে হয়। যদি ইতিহাস ঘেঁটে দেখি, তাহলে দেখব যে, ব্রিটেনে বৃহৎ শিল্পে কাপড় তৈরি হলেও ভারতবর্ষের কাপড় সেখানে গিয়ে সস্তা হয়। জাপানের মালপত্র বাজারে এসে বাকি সমস্ত মালপত্রকে বাজার থেকে আউট করে দেয়, সেগুলো বড় বড় কারখানায় নয় বাড়ীতে তৈরী হয়, যদি ছোট শিল্পগুলির অসুবিধাগুলি দুর করে এবং বড় শিল্পগুলিকে যে অতিরিক্ত সুবিধা অতিরিক্ত দেওয়া হয় তা ছোট শিল্পগুলিকে দিলে নিশ্চিত রূপে ছোটশিল্পগুলি বাজীমাত করে দেবে। আমরা জানি যে ১৯৩০-৩৭ সালের সময়ে ছোট ছোট মোটরগাড়ী চালকেরা প্রতিযোগীতায় রেলকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল। যদি শাসন এবং যুদ্ধ রেলের সাহায্যে না আসত তাহলে রেলের বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে যেত।

একাত্ম মানববাদের দ্রষ্টা

দীনদয়াল উপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের মহাপুরুষ ছিলেন, যখন সারা বিশ্বে বিভিন্ন বিচারধারা এবং পরম্পরা তীব্রভাবে প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের নবজাগরণের পরবর্তী চার শতাব্দীতে বিচারধারাগুলো নতুন পথ গ্রহণ করে নিয়েছিল। এই দৃশ্যমান বিশ্ব এখন আর কোন প্রহেলিকা নয়। সাহসী মহাকাশচারীরা এই পৃথিবী পরিক্রম করে ফেলেছে, বিজ্ঞান, জড়বাদ এবং মানবতাবাদ ঈশ্বরের রহস্যময় সত্ত্বাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছে। অন্ধবিশ্বাসের উপর বিজ্ঞান আঘাত হেনেছে। শ্রদ্ধামূলক আস্থাগুলি যুক্তির দ্বারা নরবড়ে হয়ে। ভগবান ভরসার বদলে বিবেকের ভরসা স্থান করতে থাকে। থিয়োক্রেসীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সেকুলারিজম, লোকতন্ত্রযুক্ত ব্যক্তিবাদ এবং সমাজবাদ-প্রভৃতির ধারণা প্রবল আকার ধারণ করে। ইউরোপের পুরো পরিবর্তন হয়ে যায়।

মানুষ ভগবৎকৃপা এবং ভগবৎ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতি বিজয় এবং বিশ্ববিজয় অভিযানের আয়োজন করে। ঝুঁকিপূর্ণ সন্ধান আরম্ভ হয়। নতুন নতুন দেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। বিংশ শতাব্দী এই সমস্ত সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শতাব্দী। রাষ্ট্রবাদ, ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদকে টেক্কা দিতে থাকে। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমেই এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে এইসব দেশের চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু এশিয়ার রাষ্ট্রবাদী মানসিকতা পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পশ্চিমি শিক্ষাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাই তারা পশ্চিমি শক্তিকে গ্রহণ করল না। দীনদয়াল ভারতীয় রাষ্ট্রবাদের সেই ধারার ফসল।

তিনি প্রায় দুদশকের অধ্যায়ন এবং অনুভবের পর তাঁর সিদ্ধান্ত এবং নীতিকে একাত্ম মানববাদ নামে তুলে ধরেন যা পরবর্তীতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টির বিচার ধারায় পরিণত হয়। তিনি প্রস্তাবনাতে শংকরাচার্য এবং চাণক্যকে স্মরণ করে বলেন—

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিপ্লব এনেছিল আজ এমনই দুজনের কথা স্মরণে আসছে। একজন শংকরাচার্য। যিনি সনাতন বৌদ্ধিক উপদেশ নিয়ে দেশব্যাপী বিস্তৃত অনাচারকে শেষ করতে বেরিয়েছিলেন। দ্বিতীয় চাণক্য। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলিকে একত্রিত করে সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আজও ঠিক তেমনই এক পরিস্থিতি আমাদের সামনে। যেখানে আমরা বিদেশী চিন্তা ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট চিন্তাধারার বদলে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বারা মানব-কল্যাণের এক সম্পূর্ণ ধারণা 'একাত্ম-মানববাদ' রূপে বলিষ্ঠ ভারতীয় দৃষ্টিকোণকে নতুন ভাবে একত্রিত করার কাজ শুরু করছি।

দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় চিন্তাধারার পরম্পরায় শংকরের বেদান্ত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং স্বকৃত একান্ত মানববাদ কে নতুন আধার রূপে স্থাপন করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গে দীনদয়াল দলীয় এবং পারিস্পার্শিকতা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় পেতেন। তাঁর দার্শনিক ধারণাগুলি এই সকল শিক্ষাবর্গে দেওয়া বৌদ্ধিক বর্গে মন্থন হত। ১৯৬৪ সালে জুন মাসে রাজস্থানের উদয়পুর সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে তিনি প্রথমবার একাত্ম মানববাদ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় জনসংঘের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গগুলিও তিনি একই দৃষ্টিতে দেখতেন। এই শিক্ষাবর্গগুলির মাধ্যমে পরিপক্ক হওয়া তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শন কিছু কিছু সংশোধনের পরে দুই ভাগে প্রকাশ পায়। প্রথম অংশ প্রকাশ পায় ১১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্টে, ১৯৬৪ গোয়ালিয়রে ভারতীয় জনসংঘের প্রশিক্ষণ শিবিরে। সেখানে তিনি ভারতীয় জনসংঘের জন্য, সিদ্ধান্ত অউর নীতি, বইটির খসড়া প্রস্তুত করেন। জানুয়ারী ১৯৬৫ তে বিজয়ওয়ারা অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত অউর নীতি কে জনসংঘের চিন্তাধারা বলে ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় অংশ একাত্ম মানববাদ। ২২ থেকে ২৫ এপ্রিল, ১৯৬৫ তে মুম্বাইতে একাত্ম মানববাদের উপর পরপর

চারটি ভাষণ দেন। যদিও তার বড় অংশ সংঘ শিক্ষাবর্গের বৌদ্ধিক বর্গে অন্তর্নিহিত ছিল। যা তাঁর বিশবছর ধরে দেওয়া ভাষণগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। যার অধিকাংশ আর পাওয়া যায় না। 'রাষ্ট্রধর্ম' 'পাঞ্চজন্য' এবং 'অর্গানাইজারের' প্রবন্ধগুলি এর পৃষ্ঠভূমি।

ভারতের স্বাধীনতার পরও দেশব্যাপী বৈচারিক পরনির্ভরতা তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। এই কাজের মধ্যে তার চিন্তাধারা পরিস্ফুটিত হয়। এই বিষয়ে নিজের তীব্র অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন নিজের লেখা 'সিদ্ধান্ত অউর নীতি' তে। সেখানে লিখেছেন—রাষ্ট্রের সুনিশ্চিত এবং সু-নিয়োজিত উন্নতির বদলে শাসক এবং শাসিত বিভ্রম এবং বিরক্তির স্বীকার হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরে। প্রবাহের দিকে চলতে থাকে। আস্থা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার এই অবস্থা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং আস্মিত জন্য বিপদসংকেত এবং অশোভনীয়। এটার পরিবর্তন করে দেশের পুরুষার্থকে জাগ্রত করতে হবে।

রাষ্ট্রজীবনকে গুরুত্ব না দিয়ে তার উপর বিদেশী এবং ভিনজাতীয় বিচারধারা জীবনশৈলী চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান কারণ। চটজলদি উন্নতির লালসায় অন্য দেশের অন্ধ-অনুকরণ করার এবং 'স্ব' (নিজস্ব)কে তিরস্কার করার প্রবৃত্তি তৈরি হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রমানসে অনাস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এই অনাস্থা ও অবিশ্বাসই সেই চ্যালেঞ্জ ছিল যা দীনদয়ালের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলে। ফলস্বরূপ তিনি 'একাত্ম' মানববাদ নামক অমৃত রুপী বিচার সমাজকে দিয়ে যান।

বৈচারিক পটভূমি

'একাত্ম মানববাদ' এর পঠভূমির দুটি দিক আছে। একটি হল পাশ্চাত্য জীবনদর্শন এবং অন্যটি ভারতীয় সংস্কৃতি। 'মানববাদ' প্রধানত পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনা এবং 'একাত্মতা' ভারতীয় চিন্তাভাবনা। বলা যেতে পারে পাশ্চাত্য মানববাদের ভারতীয় করণের প্রক্রিয়ার ফসল 'একাত্ম মানববাদ'।

সাধারণত বিভিন্ন লেখা এবং ভাষণে দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় সময় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের দুর্বলতার বিষয়গুলি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন।

আমরা প্রাচীন সংস্কৃতির অধ্যয়ন করেছি, তা বলে আমি প্রাচীনপন্থি নয়। কোন পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়ের সংরক্ষক হয়ে থাকতে চাই না। আমাদের লক্ষ্য শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির সংরক্ষণ করাই নয়, গতি দিয়ে তাকে সজীব এবং সক্ষম করা। অনেক রুঢ়তা আছে সেগুলিকে সমাপ্ত করতে হবে, সংশোধন করতে হবে। সমাজে যে অস্পৃশ্যতা, ভেদভাব বাসা বেঁধেছে, যার কারণে মানুষ মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না, যা রাষ্ট্রের একতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, আমাদের সেগুলোকে দূর করতে হবে।

দীনদয়াল পশ্চিমের বিকৃতির প্রতি সচেতন ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির উপাসক ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সমন্বয়কারীর। তাই তিনি বিদেশী চিন্তাধারাকে একেবারে খারাপ মনে করতেন না। আবার স্বদেশী প্রত্যেক জিনিসকে বরেণ্যও মনে করতেন না। তাঁর সূত্র হল—আমরা মানুষের সংকলিত জ্ঞান এবং উপলব্ধির বিচার করব। তার মধ্যে যেটা আমাদের সেটাকে যুগের অনুকুলে এবং যেটা বিদেশের সেটাকে দেশের অনুকুলে পরিণত করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। স্বদেশীকে যুগানুকুল এবং বিদেশীকে স্বদেশানুকুল করার তাঁর মানসিকতার কারণে দীনদয়াল বলতেন—আমরা ভারতবর্ষকে অতীতের প্রতিচ্ছায়া তৈরী করতে চাই না আবার কখনও আমেরিকা বা রাশিয়ার অবিকল নকল করতেও চাই না।

মুম্বাই এর ঐতিহাসিক ভাষণে যখন একাত্ম মানববাদ এর ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন অত্যন্ত ভাবপূর্ণ পরিবেশে বলেন—

বিশ্বের জ্ঞান এবং আজ পর্যন্ত আমাদের সম্পূর্ণ পরম্পরার উপর ভিত্তি করে আমরা এমন ভারতবর্ষ নির্মাণ করব, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী গৌরবশালী হবে।

যেখানে জন্মানো প্রত্যেকে নিজের ব্যাক্তিত্বর উন্নতি ঘটিয়ে কেবল সম্পূর্ণ মানবতার নয়, সেই সঙ্গে সৃষ্টির সাথে একাত্মতার মিলন ঘটিয়ে 'নর থেকে নারায়ণ' হওয়ায় সমর্থ হবে। এটাই আমাদের সাংস্কৃতির শাশ্বত এবং প্রবাহমান রূপ। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বিশ্ব-মানব'-এর জন্য এটাই আমাদের দিগদর্শন। ভগবান আমাদের শক্তি দিন, যাতে আমরা এই কাজে সফল হই। এটাই আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার কেন্দ্র মানুষ। যৎ পিন্ডে তত ব্রহ্মান্ডে এর মত সৃষ্টির সমস্ত জীব জগৎ-এর প্রতিনিধিত্ব করছে মানুষ। জড়বস্তু-সামগ্রী মানুষের সুখের সাধনমাত্র, সাধ্য নয়।

আমাদের আধার হল একাত্ম মানব। যা একধারে সবকিছুর প্রতিনিধিত্ব করার সামর্থ্য রাখে। একাত্ম মানববাদের ভিত্তিতেই জীবনের সব ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

ভারতীয় জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক

১৯৫১ সালে ডিসেম্বর, কানপুরে জনসংঘের প্রথম অধিবেশন থেকে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের কালিকটের চৌদ্দতম অধিবেশন পর্যন্ত জনসংঘের মহামন্ত্রী (সাধারণ সম্পাদক) ছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

জনসংঘের অধিবেশন, আন্দোলন, অভ্যাসবর্গ, প্রস্তাব সবকিছুই ছিল দীনদয়ালের ব্যক্তিত্বের আলোয় আলোকিত। সারাদেশ জুড়ে তিনি লাগাতার প্রবাস করতেন। সেই কারণে কার্যকর্তাদের কাছে তিনি কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। অধিবেশনে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করতেন, সেটা শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার্থে নয়, উপরন্তু তা ছিল সংগঠনের গতিশীলতার জন্য আত্মসমালোচনামূলক আহ্বান। মহামন্ত্রীর প্রতিবেদন জনসংঘের উন্নয়নের পথকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুতকারী সাহিত্য। এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র জনসংঘের কার্যকলাপের দস্তাবেজ নয়, রাষ্ট্রীয় ঘটনা প্রবাহের দলিলও। ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পণ্ডিত দীনদয়ালের প্রতিবেদনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়াধীন উচ্চমানের রিসার্চের বিষয় হতে পারে। এই প্রতিবেদনগুলি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলের

রাজনৈতিক সমস্যার নিষ্পত্তি, ঘটনা প্রবাহের উপর বিশেষ টীকার সম্পূর্ণ এবং জ্ঞানবর্ধক সংকলন। এই দস্তাবেজগুলি যে কোনো ইতিহাসবিদের জন্য অমূল্য নথি হতে পারে। প্রতিবেদনগুলি রাজনৈতিক কার্যকর্তাদের সিদ্ধান্তের পথনির্দেশক। তাঁর নেতৃত্বে জনসংঘের ভোট প্রতিটি নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান। বিধানসভা এবং সংসদেও জনসংঘের প্রতিনিধিত্ব বাড়তে থাকে। ১৯৬৭ সালের ঐতিহাসিক কালিকট অধিবেশনে দীনদয়াল উপাধ্যায় পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় দীনদয়াল এবং জনসংঘ প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠার শীর্ষে ছিল।

১৯৬৭ সালে, ২৯-৩১ ডিসেম্বর কালিকটে জনসংঘের চৌদ্দতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তার ঠিক ৪৪ দিন পর ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ মুঘলসরাই স্টেশনে মধ্যরাত্রিতে তাঁকে হত্যা করা হয়।

এই সময়ের তাঁর কালজয়ী ভাষণ থেকে জনসংঘ, সংঘ এবং দীনদয়ালের চিন্তাধারার নতুন স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি ভাষণ বিশেষ সময় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিই ছিল তাঁর চিন্তন মননের পৃষ্ঠভূমি।

সাধারণ জনমানসে রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ এই যুগের সর্ববৃহৎ দান। দীনদয়াল মনে করতেন এটাই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক প্রচেষ্টার পরিণাম। তিনি বলতেন—**ক্ষণিক রাজনৈতিক লাভের জন্য রাজনীতিকে মাধ্যম করা ভাল লক্ষণ নয়।**

তাঁর এই কালজয়ী কথা, যুগযুগ ধরে ভারতীয় রাজনীতির পথনির্দেশন করতে পারে।

মহাপ্রয়াণ

দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দেশগঠনের কাজে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি সংঘের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি স্থানীয় কার্যকর্তারূপে কাজ করার পর ১৯৪২ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক হন। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত

প্রচারকরূপে সঙ্ঘকাজে উত্তরপ্রদেশে কর্মরত ছিলেন। এই নয় বছর কার্যকালে তাঁর সাংগঠনিক এবং সাহিত্যিক প্রতিভা প্রখরভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি জনসংঘের মহামন্ত্রী ছিলেন। তিনি এক রাষ্ট্রীয় নায়কের চরিত্র হয়ে উঠেন, এই পরিপূর্ণ নায়কত্ব সম্পূর্ণ হয় যখন ভারতীয় জনসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি রূপে সামনে আসেন, তখন নিয়তি রহস্যজনক এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাঁর জীবনদীপ নিভিয়ে দেয়। তিনি মাত্র ৪৪ দিন জনসংঘের সভাপতি ছিলেন।

১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সাল। সময় তখন প্রায় ভোর পৌনে চারটে। মোগলসরাই স্টেশনের লিভারম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারকে টেলিফোনে জানান যে স্টেশনের প্রায় ১৫০ গজ আগে রেল লাইনের দক্ষিণদিকে ১২৭৬ নং ইলেকট্রিক পোষ্টের নিকটে পাথরের উপর একটা লাশ পড়ে আছে। লাশ পাহারা দেবার জন্য পুলিশ পাঠানো হয়। স্টেশন মাষ্টার পুলিশকে যে মেশেজ পাঠিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল মৃতপ্রায় (Almost dead). সকালে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। লাশ স্টেশনে নিয়ে আসলে উৎসাহীদের ভিড় জমে যায়। লাশ শনাক্ত হয়নি। স্টেশনে বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে পরে আছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে ওঠে, আরে, ইনি তো ভারতীয় জনসংঘের অধ্যক্ষ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের মত খবর ছড়িয়ে পরে। নেমে আসে বিষাদের ছায়া।

ফেব্রুয়ারী মাসে সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ তে দিল্লীতে জনসংঘের সংসদীয় দলের বৈঠক ছিল। নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ দীনদয়ালের প্রথমবার সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা। আগের দিন অর্থাৎ ১০ তারিখে তিনি লক্ষ্মৌতে ছিলেন। সেদিন সকালে বিহারের জনসংঘের সংগঠন মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার ফোন করেন। তিনি বলেন বাজেট সময়ে সংসদ লম্বা সময় ধরে চলবে। তাই পরের দিন ১১ ফেব্রুয়ারী পাটনাতে অনুষ্ঠিত বিহারের কার্যকারিনী বৈঠকে দীনদয়ালকে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। দীনদয়াল উপাধ্যায়

নবনির্বাচিত মহামন্ত্রী সুন্দর সিং ভাণ্ডারীর সঙ্গে আলোচনা করে দিল্লি যাবার বদলে পাটনা যাওয়া স্থির করেন।

ভারতীয় জনসংঘের মহামন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে যাতায়াত করতেন। এক্সপ্রেস ট্রেনের বদলে প্যাসেঞ্জার ট্রেন তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তিনি লেখা পড়ার জন্য সময়ও পেয়ে যেতেন। ছোট খাটো স্টেশনে যেখানে ট্রেন থামতো সেখানকার কার্যকর্তাদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাত হয়ে যেত। তিনি অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পর সকলে মিলে ঠিক করে যে দীনদয়ালজীর প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করা উচিৎ। তাই তার পাঠানকোট শিয়ালদহ ট্রেনের প্রথমশ্রেণীতে টিকিট কাটা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭ টায় সময় লক্ষ্মৌ থেকে ট্রেন ছাড়ে। তাঁকে স্টেশনে ছাড়তে আসেন তৎকালীন উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী রামপ্রকাশ গুপ্ত এবং জনসংঘের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পীতাম্বর দাস। সবার থেকে বিদায় গ্রহণ করে তিনি ট্রেনে ওঠেন। রাত্রী ১২ টার সময় জৌনপুর স্টেশনে জৌনপুরের রাজার সচিব কনাইয়ালাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। দেখা করে তিনি পণ্ডিত দীনদয়ালকে রাজাসাহেবের পত্র দেন। রাত্রি ১২.১২ টার সময় ট্রেন জৌনপুর থেকে রওনা হয়ে যায়।

তখন শিয়ালদহ-পাঠানকোট এক্সপ্রেস সোজা পাটনা যেতো না। রাত্রি ২.১৫ তে মোগলসরাই এর ১ নং প্ল্যাটফর্মে ট্রেন যখন পৌঁছায় তখন দীনদয়াল উপাধ্যায় যে কামরাতে ছিলেন, সেটা কেটে শটিং করে দিল্লি-হাওড়া এক্সপ্রেসে জুড়ে দেওয়া হয়। সেই গাড়ি রাত্রি ২.৫০ তে মোগলসরাই থেকে হাওড়া অভিমুখে রওনা দেয়। সকালে ট্রেন যখন পাটনা স্টেশন পৌঁছায় তখন দীনদয়াল ট্রেনে ছিলেন না।

অপরদিকে মুগলসরাই স্টেশনে লাশ শনাক্তকরণ হয়ে গিয়েছিল। পরমপূজনীয় মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) সহ অন্যান্য কার্যকর্তাদের কাছে এই খবর পৌঁছে যায়। দিল্লীতে সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। বৈঠক বন্ধ করে সমস্ত বরিষ্ঠ নেতারা বিশেষ বিমানে

বারানসী পৌঁছে যায়। তাঁর পার্থিব শরীর দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি দিল্লিতে শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ৩০, রাজেন্দ্রপ্রসাদ মার্গ-এর নিবাসস্থলে থাকতেন। সেখানেই তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটাকে নিয়ে আসা হয়। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে লোকজন দিল্লী পৌঁছতে শুরু করে।

শ্রীগুরুজী বারানসীতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। শ্রীগুরুজীর সঙ্গে দীনদয়ালের অনির্বচনীয় সম্পর্ক ছিল। শ্রীগুরুজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালক ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একজন আধ্যাত্মিক মহাত্মাও ছিলেন। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পার্থিব দেহের সমীপে গিয়ে সদা অবিচলিত শ্রীগুরুজীর চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ধরা গলায় বলে ওঠেন, 'আরে, এ কি হল'।

শ্রী গুরুজী দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পার্থিব শরীরের মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে সেই হাত নিজের চোখে ছোঁয়ান। তিনবার এইরকম করার পর ধরা গলায় বলেন— প্রচুর মানুষ নিজেদের সংসার চালায়, তারা এটা কল্পনা করতে পারবে। কিন্তু আমি সংসার চালাই না, তাই আমার দুঃখের ভাবনা সাধারণের থেকে শতগুণ বেশী। তাই তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না। শুধু এটুকুই বলব—ভগবান দীনদায়ালকে ছিনিয়ে নিলেন। ইংরেজিতে একটা কথা পড়েছিলাম—ভগবান যাদের ভালোবাসে, কম বয়সে তারা স্বর্গে চলে যায়।

পুরো দিল্লীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। অফিস বাজার সব বন্ধ। মানুষজন ৩০ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভীড় বেড়েই চলেছে। পুষ্পবৃষ্টি, মাল্যদান, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, দুঃখ, কান্না চলেছে। ভীড় সামলাতে পুলিশ ও স্বসংসেবকদের হিমশিম অবস্থা। এই মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রপাতের মত। সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কে এই ঋষিতুল্য অজাতশত্রুকে হত্যা করেছে? কে দেবে এর জবাব? সকলেই তো মর্মাহত।

১২ ফেব্রুয়ারী সকালে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হুসেন শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, উপপ্রধানমন্ত্রী

মোরারজী দেশাই পুষ্প-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। নেতা, সমাজিক কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক যোদ্ধা সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণের জন্য ভীড় করেন। জনসাধারণও শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করার জন্য দিল্লীতে জমায়েত হয়। দিল্লী জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

দুপুর একটার সময় মহামানব পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পার্থিব শরীর শবযানে রাখা হয়। মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত শবযাত্রার সামনে চারজন অশ্বারোহী সৈন্য, শবযানের সামনে সঙ্ঘ ও জনসঙ্ঘের অধিকারী, কার্যকর্তারা চলেছেন। রাস্তার দুই ধারে জনসাধারণ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, অন্তিমদর্শন এবং পুষ্প অর্পণ করার জন্য উপস্থিত। পিছনের দিকে মহিলারা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে চলেছে। শ্রদ্ধাঞ্জলী, পুষ্প বর্ষণের কারণে মন্থরগতিতে চলতে চলতে সন্ধ্যা ৬টার সময় শবযাত্রা নিগমবোধ ঘাটে পৌঁছায়। সন্ধ্যা ৬.৪৫ তে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণের কার্যক্রম শুরু হয়। ৭.০৬ তে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে তাঁর মামাতো ভাই শ্রী প্রভুদয়াল শুক্ল অগ্নিসংযোগ করেন। দীনদয়ালের পার্থিব শরীর পঞ্চতত্বে বিলীন হয়ে যায়।

একাত্ম মানববাদ প্রশ্ন উত্তর

১। একাত্ম মানববাদ কি?

উত্তর — 'একাত্ম মানববাদ' হল একটি বিচারধারা। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সমগ্র জগতের জন্য এই বিচারধারা ব্যক্ত করেছেন।

২। এই বিচারধারার বিশেষত্ব কি? কেনই বা সমগ্র মানব সমাজের জন্য তা প্রয়োজন?

উত্তর — ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় দেশের প্রগতির জন্য (১৯৪৭) ভারতের সামনে দুটি রাস্তা খোলা ছিল, প্রথম, পুঁজিবাদ এবং দ্বিতীয়টি সমাজবাদ। এই দুটি পথেরই উৎপত্তি হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশে বা ইউরোপে। ঐ দেশগুলির সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাদের জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু ভারতের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশের জন্য কখনও তা উপযুক্ত ছিল না। বিশেষ করে যে বিচারধারার জন্ম ও তার বেড়ে ওঠার মধ্যে কোনো ভারতীয় নেই, ভারতীয়ত্ব নেই এবং যে বিচারধারা ভারতের সমাজে পরীক্ষিত নয়। দীনদয়ালজী বলেছেন, আমাদের নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিচার করে, নিজের দেশ ও বিশ্বের প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের বিচারধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। কাউকে নকল করে কখনও শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না।

৩। কিন্তু গান্ধীজী তো রামরাজ্য ও গ্রামরাজ্যের কথা বলতেন। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের কথা কেন এল?

উত্তর — একথা অতীব সত্যি যে গান্ধীজী রামরাজ্য ও পল্লী উন্নয়নের পক্ষে বলতেন এবং আমাদেরও সেই পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই গান্ধী ও তাঁর বিচারধারাকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা শুরু হল, পণ্ডিত দীনদয়ালজী যার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

৪। এই পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ বিচারধারাগুলি কি ধরনের? দীনদয়ালজী কেনই বা এর বিরোধী ছিলেন?

উত্তর — প্রকৃতপক্ষে এই পুঁজিবাদ বাস্তবে হল ব্যক্তিবাদ। ইউরোপে ব্যক্তিবাদের বিরোধী ব্যক্তিরা একে পুঁজিবাদ নামে অভিহিত করেন। এই বিচারধারা মনে করে মানুষ কেবলমাত্র একজন 'ব্যক্তি'। এই বিচার সমাজের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। ব্যক্তির স্বাধীনতাই মানুষের সুখের সমস্ত আধার বলে মনে করে এই বিচার। এর ফলে স্বাধীন ব্যক্তি যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করে, তখন সমাজের মধ্যে বিষময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেই সময় কার্লমার্কস তার মতবাদ প্রকাশ করে বলেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোনো একক বা ব্যক্তি নয়, সে হল সমাজ। সমাজের মধ্যে সমানতা আনার জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তি বা একক আবার মানুষ কোনো ব্যক্তি বা একক নয়, সে হল সমাজ— ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের এই বিতর্কের মধ্যে বিকশিত হল পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ। এই দুটি বিচারধারাই জড়বাদী। এই দুই মতবাদই আধ্যাত্মতিকতার বিরোধী। এই দুটি মতবাদের জন্ম ও বিকাশ বিদেশে হয়েছে। এরা আধ্যাত্মবাদকে স্বীকারই করে না। তারা সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র জড়বাদী হতে পারে না। তার পূর্ণ বিকাশের জন্য আধ্যাত্মবাদও একান্ত প্রয়োজন। এই বিচারধারা মানুষকে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভক্ত করে, বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ আলাদা নয়, তা একে অন্যের পরিপূরক— এই কারণগুলির জন্যই দীনদয়ালজী এই বিচারগুলির বিরোধী ছিলেন।

৫। পণ্ডিত দীনদয়ালজী এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি বলেছেন?

উত্তর — ভারতীয় পরম্পরা যা গান্ধীজীরও বক্তব্য ছিল সেই পরম্পরা কখনো ব্যক্তি বা সমাজকে বিভক্ত করে না, এবং মানুষকে কেবলমাত্র জড়বাদী বলে মনে করে না।

৬। তাহলে ভারতীয় পরম্পরা মানুষকে কি মনে করে?

উত্তর — ভারতীয় পরম্পরা মানুষকে 'একাত্ম' বলে মনে করে। একাত্ম অর্থাৎ যাকে বিভক্ত করা যায় না। যা ভাগ করা যায় না তাই 'একাত্ম'। সমাজ

ও ব্যক্তি এমনভাবে যুক্ত যে তাদের আলাদা করা যায় না। মানুষ একজন ব্যক্তি হিসাবে সমাজের অভিন্ন অঙ্গ। আবার একজন ব্যক্তি তার পরিবার ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। অন্যদিকে একটি পরিবার তার পাড়া, গ্রাম, শহর ছাড়া একাকী থাকতে পারে না। ঠিক সেইভাবে গ্রাম শহরের পরে দেশ ও বিশ্বের স্থান। ব্যক্তি এই প্রতিটি বিভাগের একটি অংশ, তার থেকে আলাদা নয়। 'একাত্ম মানবের' সুখ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভক্ত নয়, তা সম্পূর্ণরূপে একাত্ম।

৭। পুঁজিবাদী বা সমাজবাদীরা কি একথা স্বীকার করে না?

উত্তর — পুঁজিবাদী দার্শনিক সমাজকে বন্ধন বলে মনে করেন। ব্যক্তির স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করেন। আবার সাম্যবাদী বিচারক ব্যক্তিকে লোভী মনে করে, তাদের উপর সমাজের কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বলে থাকেন। পুঁজিবাদীরা বলে 'স্বাধীনতার মধ্যেই সুখ' আর সাম্যবাদীরা বলে, 'সুখের জন্য সমানতা অত্যন্ত জরুরি।' দীনদয়ালজী বলেছেন, মানুষের জন্য স্বাধীনতা ও সমানতা দুটোই একান্ত জরুরি। স্বাধীনতা ও সমানতা একে অন্যের বিরোধী একথা মনে করা ভুল। এ দুটি একে অন্যের পরিপূরক।

তিনি আরও বলেছেন, 'মানুষ কেবল ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যেই একাত্ম নয়। এই সংসার অর্থাৎ প্রকৃতিরও অভিভাজ্য অঙ্গ। মানুষ যদি প্রকৃতির সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করে বা প্রকৃতিকে শোষণ করে, তবে দুঃখ অনিবার্য। ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে প্রকৃতি হল মাতৃস্বরূপা। প্রকৃতিকে নষ্ট করা, নোংরা করা বা ধ্বংস করা হল পাপ। এই সৃষ্টি কেবলমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের কারণে তৈরি হয়নি। মানুষ কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করবে তা শেখা একান্ত জরুরি। প্রকৃতির সঙ্গে তার ব্যবহার কিরূপ হবে মানব সুখের তাও এক মস্ত কারণ।

(একাত্ম মানববাদ পুরো জানতে বা বুঝতে হলে সম্পূর্ণ দীনদয়াল রচনা আমাদের পড়তে হবে।)

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
ভারতীয় সংস্কৃতি ট্রাস্ট

প্রকাশকাল ঃ রথযাত্রা, ২০১৬
দোলযাত্রা, ২০২০

মুদ্রক ঃ
ইন্টারন্যাশানাল প্রিন্টিং
৬০, হরি ঘোষ স্ট্রীট্
কলকাতা - ৬

সহযোগ রাশি ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

'মহাপুরুষ কে? এ সম্পর্কে' নানা মুণির নানা মত, কিন্তু সব থেকে গ্রহণযোগ্য মতটি হল, জীবিত অবস্থায় তাঁকে সকলে না জানলেও মৃত্যুর পর তাঁর ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে যায়। তখন তাঁর থেকেও তাঁর প্রচারিত বিচারধারা সমাজে বেশী পরিচিত হয়। ভারতে এমন মহাপুরুষের তালিকা দীর্ঘ। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক থেকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি। ২৫ বছরের এই যাত্রাপথে তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন, সংগঠনকে যে ভাবে গড়ে তুলেছেন তখনকার জনসঙ্ঘ থেকে আজকের পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপির মাধ্যমেই তা প্রমাণিত।

ত্যাগ, সাধনা, সততা, অনুশাসন আর লক্ষ লক্ষ আদর্শনিষ্ঠ কার্যকর্তার মাধ্যমে আজ সারা বিশ্বে দীনদয়ালের বিচারধারা পরিব্যপ্ত।

নিছক রাজনেতা নয়, তিনি ছিলেন রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক দূত। সংস্কৃতি ছাড়া রাজনীতি ভারতের মত দেশের পক্ষে বিপদজনক। যে বিপদ আমরা গত কয়েক দশক ধরে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। যে সংস্কৃতি শূন্য রাজনীতি জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদকে হত্যা করেছে। সেই হিংসাই দীনদয়ালকে অকালে থামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের বিচারধারা থামাতে পারে নি। শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে সেই বিচারধারা, মূল্যবোধের জন্য তৃষিত।

বিশ্বকবির ভাষায় 'সেই বারি তীর্থবারি যা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে'।

দীনদয়ালের 'একান্ত মানববাদ' বা একাত্ম মানবদর্শন তীর্থবারি হয়ে আগামীদিনে বিশ্বকে শান্তির সন্ধান দেবার জন্য উন্মুখ।

ছোট্ট এই পুস্তিকাটি হিন্দী ও ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীমতি পলি মল্লিক, শ্রী প্রণয় রায় ও শ্রী পীতম্বর মণ্ডল, প্রচ্ছদে শ্রী অনিন্দ্য ব্যানার্জী। সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশক